POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ۝

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

সংখ্যা 34

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 25 আগস্ট, 2022 26 মহররম1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) মদের ব্যবসাও হারাম আখ্যায়িত করেছেন।

২০৮৩) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) বলেছেন: মানুষ এমন এক যুগ প্রত্যক্ষ করবে যখন লোকেরা কোনও জিনিস গ্রহণের সময় হালাল বা হারাম হওয়ার বিষয়ে পরোয়া করবে না।

২০৮৪) হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলি নাযেল হয় তখন নবী (সা.) সেই আয়াতগুলি মসজিদে পাঠ করে শোনান এবং তিনি (সা.) মদের ব্যবসাও 'হারাম' (অবৈধ) আখ্যায়িত করেন।

হযরত খুব্বাব (রা.)-এর ঈমান ও অবিচলতা।

২০৯১) হযরত খুব্বাব বিন আরত (রা.) বর্ণনা করেন, আমি অজ্ঞতার যুগে লোহকার ছিলাম। আস বিন ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে পাওনা ঋণ চাইতে গেলে সে বলল, 'আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে দিব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মহম্মদ (সা.) কে প্রত্যাখ্যান কর।' আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর পুনরায় জীবিত করলেও আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করব না। সে বলল, 'বেশ তো। সেই সময় পর্যন্ত আমাকে থাকতে দাও যখন আমাকে মৃত্যু দেওয়া হবে এবং পুনরায় জীবিত করা হবে। (সেখানে) যে সব সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ হবে (তা থেকে) আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিব।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

আত্মার সুখ কিসে তা জগত যদি জানত! আর তা কেবল কুরআন শরীফেই বিদ্যমান সে কথা যদি জানতে পারত!

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমি লক্ষ্য করেছি যে বর্তমান যুগে পৃথিবীর মনোযোগ জাগতিক জ্ঞান লাভের প্রতি নিবন্ধ রয়েছে। পশ্চিমের (জ্ঞানের) আলো বিশ্বকে নিত্যনতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি দ্বারা চমকিত করেছে। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানেরা নিজেদের সমৃদ্ধি ও সফলতার পথ খুঁজে পেতে পশ্চিমাবাসীদেরকে নিজেদের নেতার আসনে বসিয়েছে আর ইউরোপের অনুসরণকে গর্ব হিসেবে দেখছে। এই হল আলোকিত চিন্তাধারার নতুন মুসলমানদের অবস্থা। আর যারা পুরোনো ফ্যাশনের চিন্তাধারার মানুষ আর নিজেদেরকে ধর্মের অভিভাবক বলে মনে করে, তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় ও সারাংশ হল তারা আরবী ব্যকরণের বিবাদ-বিসংবাদ আর 'যাল্লীন' উচ্চারণের বিতর্কে লিপ্ত। কুরআন শরীফের প্রতি তাদের মোটেই মনোযোগ নেই। আর কিভাবেই বা হবে যখন কি না আত্মশুদ্ধির প্রতি তারা দৃষ্টি দেয় না।

অবশ্য একটি দল এমনও আছে যারা আত্মশুদ্ধি করার দাবি করে- সেই দলটি হল সুফি ও সাজাদানশীনদের দল। কিন্তু তারা কুরআন শরীফ ত্যাগ করে নিজেদের উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করেছে। কেউ চিল্লাকশী (নিভৃতে চল্লিশ দিনের ইবাদতের বিশেষ পন্থা) করে, কেউ 'ইল্লাল্লাহ্' ধ্বনি তোলে, কেউ 'নাফি ও আসবাত' (বাতিল ও অনুমোদন), নিবিষ্টতা, শ্বাস-নিয়ন্ত্রন প্রভৃতি পন্থা অনুসরণ করছে। বস্তুত, তারা এমন সব পন্থা উদ্ভাবন করেছে যা রসুলুল্লাহ্ (সা.) শেখান নি আর কুরআন শরীফের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আর নবুয়ত এমন পন্থাকে সমর্থনও করে নি। মোটকথা স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে আর আত্মশুদ্ধি করে, ততক্ষণ কুরআনের জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতা লাভ হয় না। কুরআন শরীফে সেই সকল তত্ত্বজ্ঞান ও সত্য বর্ণিত হয়েছে যা আত্মার পিপাসা নিবারণ করে।

আত্মার সুখ কিসে তা জগত যদি জানত! আর তা কেবল কুরআন শরীফেই বিদ্যমান সে কথা যদি জানতে পারত!

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

চুক্তি মান্য করা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ জরুরী। অতএব মানুষের উচিত যেভাবেই হোক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যাতে বিশ্বাস বজায় থাকে আর মানুষ স্বেচ্ছায় ভালবেসে অপরের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয় আর এইরূপে জাতির অগ্রগতি হয়।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৯১ নং আয়াত

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِيۡتَآئِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَيَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ وَالۡبَغۡىِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ

এই আয়াতটিকে একটি নতুন বিষয় হিসেবেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে আর পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের ধারাবাহিকতাও বর্ণনা করা যেতে পারে। যদি পূর্বের আয়াতের বিষয়ের ধারাবাহিতা ধরা হয় তবে এর অর্থ হবে যে নিজেদের মধ্যেকার চুক্তিসমূহকে যথাযথভাবে রক্ষা কর। যদি তোমরা চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর তবে খোদা তা'লা তোমাদের যে সুদৃঢ় জামাত তৈরী করেছেন সেই জামাতটি ধ্বংস হয়ে যাবে আর পারস্পরিক বিশ্বাস ক্রমশ দুর্বল হতে থাকবে।

চুক্তি মান্য করা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ জরুরী। কেননা জামাতের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হল পরস্পরের প্রতি সদয় আচরণ আর তা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ মানুষ চুক্তি মান্য করে চলে। মানুষ চুক্তি মেনে না চললে প্রথমে হতাশা এবং পরে সংশয় প্রবণতা সৃষ্টি হয়। আর একজন ব্যক্তির অপকর্মের পরিণামে অবশিষ্ট শত শত মানুষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব মানুষের উচিত যেভাবেই হোক নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যাতে বিশ্বাস বজায় থাকে আর মানুষ স্বেচ্ছায় ভালবেসে অপরের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয় আর এইরূপে জাতির অগ্রগতি হয়।

ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি ছাড়াও রয়েছে জাতীয় চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ জাতির উন্নতির জন্য জনগণ এক ব্যক্তির হাতে অঙ্গীকারবন্ধ হয় যার নাম খিলাফত। সেই অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত আর এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, খোদা তা'লা তোমাদেরকে একটি জামাত হিসেবে তৈরী করেছেন আর এক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর তোমরা সেই ব্যবস্থাপনা মেনে চলার শপথ নিচ্ছ। অতএব, সেই ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করো, অন্যথায় এর পরিণাম এই দাঁড়াবে যে তোমাদের আত্মত্যাগের ফলে যে ইসলামের যে প্রতাপ ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ক্রমশ স্তিমিত হবে এবং পুনরায় নতুন করে পরিশ্রম করতে হবে। এটি

এরপর শেষের পাতায়...

জুমআর খুতবা, ২২ জুলাই ২০২২

ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান। প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: এক আরব ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনও ব্যক্তি মারা যায় আর তার রোযা বাকি থেকে যায়, সেক্ষেত্রে তার সন্তানেরা তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারে। এ বিষয়ে জামাতের অবস্থান কি?

হুযুর আনোয়ার(আই.) ২০২১ সালের ২৪ শে মে তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

নামায ও রোযা হল দৈহিক ইবাদত। তাই এর পুণ্য তারাই লাভ করে যারা এই ইবাদত সম্পাদন করে। অতএব, আমার মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায ও রোযা রাখা মৃত্যের সন্তানদের দায়িত্ব নয়।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি সহ অধিকাংশ ফিকাহবিদদের মতে এমন রোযা রাখা সঠিক নয়। তাদেরও যুক্তি হল রোযা হল দৈহিক ইবাদত যা শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব, কিন্তু মৃত্যুর পর এবিষয়ে কারো প্রতিনিধিত্ব চলে না।

(আল ফিকাতুল ইসলামি ওয়াদিলাহ কিতাবুস সওম)

হাদীস গ্রন্থগুলিতে এই ধরণের বর্ণনার বিষয়ে বলতে হয় যে, হাদিস বিশারদ এবং বিশ্লেষকরা এই রেওয়ায়েতগুলির বর্ণনায় বিভিন্ন হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন মৃতের পক্ষ থেকে তার সন্তানদের রোযা রাখার রেওয়াত বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে এও বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতের পক্ষ থেতে রোযা রেখো না, বরং তার পক্ষ থেকে আহার করাও। (ফাতহুল বারি শারাহ বুখারী, কিতাবুস সাওম)।

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত এই ধরণের রেওয়াতে একাধিক মতবিরোধ পাওয়া যায়। যেমন, এক স্থানে প্রশ্নকর্তা রয়েছে কিন্তু অপর স্থানে রয়েছে প্রশ্নকর্ত্রী। অনুরূপভাবে রোযার বিষয়েও এই মতবিরোধ রয়েছে যে সেগুলি রমযানের রোযা ছিল বা মান্নতের রোযা ছিল। তাছাড়া এক স্থানে রোযার বিষয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর অপর স্থানে হজ্জের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে।

(শারাহ বুখারী, হযরত সৈয়্যদ জায়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৩০)

অতএব, এই ধরণের মতবিরোধের কারণে হাদিসবিশারদগণের মাঝেও মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু কিন্তু কেউ এটিকে ওয়াজিব হিসেবে আখ্যায়িত করেন নি।

তবে মৃতের পক্ষ থেকে যদি কোনও কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে যা মানুষের উপকারে আসে তা নিরবিচ্ছিন্ন সদকা বা সদকা জারিয়ার মূল্য রাখে যার পুণ্য মৃতের কাছে পোঁছয়।

প্রশ্ন: হুযুর (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে পুরুষদের জন্য হলুদ বর্ণের পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি এই রঙের পোশাক ব্যবহার করতেন। এই দুটি হাদীসের মাঝে কিভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়?

হুযুর (সা.) ২০২১ সালের ২৪ শে মে তারিখের চিঠিতে লেখেন- হাদীসগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে পুরুষদের জন্য 'মুসাফার' 'ওয়ারস' এবং 'উফরান' রাঙা কাপড় (যা সাধারণত হলুদ ও লাল রঙের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ), এছাড়া খাঁটি রেশম বা 'কুসসা' (এক ধরনের রেশম)-এর পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাহ) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস)।

অপরদিকে 'আসফার' এবং 'সাফরা' (বস্তুত এগুলিও হলুদ রঙ) হুযুর (সা.) নিজেও ব্যবহার করতেন আর খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য সাহাবাগণও এই রঙের পোশাক ব্যবহার করতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (সা.) লাল এবং হলুদ রঙের জুব্বা পরিধান করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হুযুর (সা.) কে হলদু রঙ দ্বারা নিজের দাড়ি এবং চুল রঙ করতে দেখেছি তাই আমি নিজেকে (চুল ও দাড়িকে) এই রঙে রাঙাই। (সহী বুখারী, কিতাবুল ওজু)

অনুরূপভাবে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ -এর শরীরে হলুদ রঙ দেখে তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি (রা.) বলেন যে তিনি বিয়ে করেছেন তাই তার গায়ে হলুদ রঙ লেগে আছে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক)

বিভিন্ন প্রকারের রঙ এবং শেডস হয়। হাদীস অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, হুযুর (সা.) এক বিশেষ প্রকারের হলুদ রঙের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করেছিলেন যা সেই যুগে এবং সেই অঞ্চলের মহিলারা ব্যবহার করত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুযুর (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রা.) গোলাপি প্রবণ হলুদ পরিহিত দেখে তা অপছন্দ করেন। যার ফলে হযরত আমর (রা.) সেই কাপড়টি পুড়িয়ে ফেলেন। হুযুর (সা.) একথা জানাতে পেরে তাকে বললেন, কাপড়টি না পুড়িয়ে তোমার কোনও স্ত্রীকে দিয়ে দিতে পারতে। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস) অথবা কাফেরা এই ধরণের হলুদ কাপড় পরত। সেই কারণেই হুযুর (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে কাফের সদৃশ্য হওয়া থেকে বাঁচাতে উক্ত রঙের ব্যবহার সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল লিবাস)

যেভাবে হুযুর (সা.) সাময়িকভাবে কয়েক প্রকার বাসন ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন যা উক্তর অঞ্চলে সুরা পানের জন্য ব্যবহৃত হত। (সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

সূরা বাকারায় বানী ইসরাঈল জাতির গাভীর রঙের স্পষ্টীকরণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: কিছু কিছু পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে আর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেগুলির জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়। গাঢ় হলুদ রঙটিও এমন একটি রঙ। কেউ তাকে হলুদ বলে, কেউ আবার গেরুয়া বলে। গেরুয়া রঙটিকে বিভিন্ন ব্যক্তির সামনে রাখা হলে কেউ তাকে লাল বলবে, কেউ হলুদ বলবে।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৫-৫০৬)

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, মুসাফার এবং ওয়ারস এবং গেরুয়া রঙে রাঙা কাপড় অতি মূল্যবান এবং রেশমের পোশাকের ন্যায় সেই যুগে অহংকার এবং গর্বের প্রতীক হিসেবে ধরা হত। সেই কারণে হুযুর (সা.) সাহাবাদের তরবীয়তের কথা দৃষ্টিতে রেখে এবং তাদেরকে জাগতিক জাঁকজমকের পরিবর্তে পরলৌকিক পুরস্কাররাজির প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং তা নিয়ে গর্ব এবং অহকার করার পরিবর্তে তাদের মাঝে বিনয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই ধরণের মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং এর বিপরীতে সাধারণ হলুদ ব্যবহার বা সাধারণ হলুদ পোশাক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন যেগুলির পরিণামে পাপ এবং জাগতিক জাঁকজমকের দিকে আকর্ষণ তৈরী হতে পারে।

এই কারণেই পুরুষদের এই রঙের ব্যবহারের বিষয়ে সাহাবা এবং তাবে তাবেঈন এবং তাঁদের অনুসারী উলেমা ও ফিকাহবিগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আবু হানিফা, হযরত ইমাম মালিক এবং হযরত ইমাম শাফি সহ অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এই রঙের ব্যবহার বৈধ। অপরদিকে কিছু কিছু ফিকাহবিদ এটিকে অপছন্দনীয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ তারা ততটা কঠোরতা সঙ্গে নিষেধ না করেন নি অথচ এই কাজ করলে কোনও পুণ্য লাভ বা না করলে কোনও শাস্তির সতর্কবার্তা দেন নি।

সুতরাং হুযুর (সা.) মুসলমান জাতিকে যে বিশেষ রঙের শেড ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন তা হযরত উসমান কখনই ব্যবহার করেন নি, বরং সেই ধরণের হলুদ রঙটি হুযুর (সা.) নিজেও ব্যবহার করেছেন আর অন্যান্য সাহাবারাও তা ব্যবহার করেছেন। হযরত উসমান (রা.) যে রঙ ব্যবহার করতেন তার জন্য হাদীসে 'আসফার' এবং 'সাফরা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, 'মুসাফার' এবং 'যাফরান' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি।

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ"

হাদিসটির হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে ব্যাখ্যা করেছেন তার উল্লেখ করে উক্ত হাদীসে দ্বিতীয়াংশ, অর্থাৎ ঘোড়া, মহিলা এবং বাড়িতে অমঙ্গল থাকার বিষয়ে হওয়া আপত্তি প্রসঙ্গো

এরপর ৯ পাতায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

সালাসিলের যুদ্ধে বিজয় লাভের একটি বড় কারণ ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেই কর্মপন্থা যা তিনি ইরাকের কৃষকদের জন্য গ্রহণ করেছিলেন আর হযরত খালেদ (রা.) কঠোরভাবে এর অনুসরণ করেছিলেন। এই কর্মপন্থার অধীনে তিনি (রা.) কৃষকদের প্রতি কোন প্রকার বিরোধ প্রদর্শন করেননি। যেখানে যেখানে তাদের বসতি ছিল তাদেরকে সেখানেই থাকতে দিয়েছেন আর জিযিয়ার সামান্য অর্থ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের জরিমানা বা কর আদায় করেন নি।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৫ জুলাই , ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৫ওয়াফা, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,যেমনটি গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, আজ হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইরানীদের বিরুদ্ধে (পরিচালিত) বিভিন্ন অভিযানের উল্লেখ করা হবে। এ ধারাবাহিকতায় সংঘটিত একটি যুদ্ধহলো এটিকে যাতুস্ সালাসিল(তথা শিকলের যুদ্ধ) বা কাযেমার যুদ্ধ বলা হয়। দ্বাদশ হিজরীরমহররম মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধটি তিনটি নামে সুপরিচিত।প্রধানত সালাসিলের যুদ্ধ, কাযেমার যুদ্ধ এবং হাফীরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে যাতুস্ সালাসিল অর্থাৎ, শিকলের যুদ্ধ বলার কারণ হলো,আরবী ভাষায়সিলসিলা বা শিকলের বহুবচন হচ্ছে সালাসিল। কেননাএই যুদ্ধে ইরানী সেনাবাহিনী পরস্পর পরস্পরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়েছিল যাতে কেউ যুদ্ধ থেকে পালাতে না পারে। (তবে) কোন কোন ঐতিহাসিক সালাসিলের যুদ্ধের এই রেওয়ায়েতকে গ্রহণ করেন নি। মুসলমান ও ইরানীদের মাঝে 'কাযেমা' নামক জায়গার নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাই একে কাযেমার যুদ্ধ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। বসরা থেকে বাহরাইন যাওয়ার পথিমধ্যে সমুদ্র তীরের একটি বসতি হলো, কাযেমা।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা-উস্তাদ উমর আবুন নাসার,পৃ: ৬৬৪) (আল কামিলু ফিত তারিখু ,২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৯) (আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, অনুবাদক- শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ২৭২) (মুজামুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৮)

হাফীর অঞ্চলে সংঘটিত হওয়ার কারণে এই যুদ্ধকে হাফীরের যুদ্ধও বলা হয়।

(আস সিদ্দীক, পৃ: ১২৭, প্রণেতা-প্রফেসর আলি মহসিন সিদ্দীক)

এই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। আর ইরানী সেনাপ্রধানের নাম ছিল হুরমুয। মুসলমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল আঠারো হাজার।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

যেমনটি পূর্ববর্তীবিভিন্ন খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল, ইরানীদের পক্ষ থেকে হুরমুয অত্রাঞ্চলের শাসক ছিল। বংশমর্যাদা এবং সম্মান ও সম্ভ্রমের দিক থেকে অধিকাংশ ইরানী শাসকের তুলনায় সে এগিয়ে ছিল। সম্ভ্রান্ত ইরানীদের রীতি ছিল তারা সাধারণ টুপির পরিবর্তে মূল্যবান টুপি পরিধান করতো,আর বংশমর্যাদা ও মান-সম্মানের নিরিখে যে ব্যক্তি যেমনমর্যাদার হতো সে অনুসারেমূল্যবান টুপি পরিধান করতো। কথিত আছে, সবচেয়ে মূল্যবান টুপি ছিল এক লক্ষ দিরহামের, যা সেই ব্যক্তিই পরিধান করতে পারতো যে সম্মান ও মর্যাদা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সর্বোচ্চ মানে উপনীত থাকত। আর এদিক থেকেও হুরমুযের পদমর্যাদার কথা অনুমান করা যায় যে, তার টুপির মূল্যও এক লক্ষ দিরহাম ছিল।

ইরানীদের দৃষ্টিতে তার পদমর্যাদা স্বীকৃত ছিল ঠিকই কিন্তু ইরাক সীমান্তে বসবাসকারী আরবদের মাঝে তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হত। কেননা সে এসব আরবের ওপর সকল সীমান্তবর্তী(অঞ্চলের) শাসকের চেয়ে বেশি নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাত। এসব অমুসলমান আরবদের ঘৃণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে,তারা কারো নোংরামীর উল্লেখ করতে গিয়ে প্রবাদ হিসেবে হুরমুযের নাম উল্লেখ করত। যেমন, (তারা) বলত, অমুক ব্যক্তি তো হুরমুযের চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট, অমুক তো হুরমুযের চেয়েও বেশি নোংরা প্রকৃতির এবং নোংরা স্বভাবের। অমুক ব্যক্তি তো হুরমুযের চেয়েও বেশি অকৃতজ্ঞ। এ কারণেই হুরমুযকে প্রায়ই আরবদের (চোরাগোপ্তা) হামলার শিকার হতে হতো। আর অপরদিকে হিন্দুস্তানের জলদস্যুদের পক্ষ থেকেও হুরমুযকে আক্রমণের মুখোমুখি হতে হতো।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-হ্যায়কাল, পৃ: ২৬৯-২৭০)

যাহোক, হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইয়ামামা থেকে যাত্রা করার পূর্বে হুরমুযকে পত্র লিখেছিলেন। তিনি তার পত্রে লিখেন, পরসমাচার! আনুগত্য স্বীকার করো,তাহলে নিরাপদ থাকবে। অথবা নিজের ও স্বজাতির জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে নাও এবং জিযিয়া বা কর দিতে সম্মত হও, নতুবা তুমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে পরিণতির জন্য দায়ী করতে পারবে না।

আমি তোমার মোকাবিলা করার জন্য এমন জাতি নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে সেভাবে ভালোবাসে যেভাবে তোমরা জীবনকে ভালোবাস।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

হযরত খালেদ (রা.)-এর পত্র যখন হুরমুযের কাছে পৌঁছে তখন সে পারস্য সম্রাট আর্দশীরকেএর সংবাদ দেয় এবং নিজের সেনাদল জড়ো করে, আরএকটি দ্রুতগামী সেনা বহর নিয়ে ত্বরিৎ হযরত খালেদকে মোকাবিলা করার জন্য কাযেমা পৌঁছায়। সে নিজ অশ্বারোহীদের চেয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায় কিন্তু সে সেই পথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদকে (দেখতে) পায়নি। (ইতঃমধ্যে) সে সংবাদ পায় যে, মুসলমানদের সেনাদল হাফীরে সমবেত হচ্ছে; তাই সে ফিরে হাফীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বসরা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে প্রথম মঞ্জিল ছিল হাফীর। সেখানে পৌঁছেই নিজের সেনাদলের সারিবিন্যাস করে। হুরমুয নিজের ডানে-বামে দুভাইকে নিযুক্ত করে। তাদের মধ্যে একজনের নাম কুবায এবং অন্যজনের নাম ছিল অনুশেজান। ইরানীরা স্বয়ং নিজেদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়েছিল। এই রেওয়ায়েতে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে আর এটিও বলা হয় যে, তখন সেসব মানুষ যাদের মতামত এর বিরোধী ছিল তারা এমন দৃশ্য দেখে বললো, শত্রুর জন্য তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়েছ, এমনটি করো না। এটি অশনি সংকেত। যারা শিকলাবদ্ধ হওয়ার পক্ষে ছিল, তারা প্রত্যুত্তরে বলে, তোমাদের সম্পর্কে আমরা খবর পেয়েছি যে, তোমরা পলায়নের ইচ্ছা রাখো। হযরত খালেদ (রা.) যখন হুরমুযের হাফীরে পৌঁছার সংবাদ পান তখন তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে কাযেমার দিকে পথ পরিবর্তন করে নেন।

হুরমুয এ সংবাদ পেয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ কাযেমা অভিমুখে যাত্রা করে এবং সেখানে (গিয়ে) শিবির স্থাপন করে।হুরমুয ও তার সেনাবাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে আর পানি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ যখন পৌঁছেন তখন তাকে এমন স্থানে শিবির স্থাপন করতে হয়, যেখানে পানি ছিল না। লোকজন তার কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ করে।

তার ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, সবাই (বাহন থেকে) নেমে আসুন আর মালপত্র নীচে নামিয়ে আনুন এবং পানির জন্য শত্রুর সাথে লড়াই করুন। কেননা খোদার কসম! পানির ওপর তাদেরই নিয়ন্ত্রণ থাকবে, দুপক্ষের মাঝে যারা সবচেয়ে বেশি অবিচল থাকবে এবং উভয় সেনাদলেরমাঝে বেশি সম্মানিত। এই(ঘোষণার) পর মালপত্র নীচে নামিয়ে আনা হয়। বাহনে আরোহিত সৈন্যরা নিজেদের স্থানে অবিচল থাকে আর পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হয় এবং শত্রুদেরওপর আক্রমণ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হলে আল্লাহ্ তা'লা একখণ্ড মেঘ প্রেরণ করেন। মুসলমানসারির পেছনে বৃষ্টি হয়, এতে মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ় হয়। হুরমুয হযরত খালেদের জন্য একটি ফন্দি আঁটে। সে তার রক্ষীবাহিনীকে বলে, আমি হযরত খালেদকে মোকাবিলার আহ্বান জানাবো,আমি তাকে আমার সাথে ব্যস্ত রাখব (আর) তোমরা চুপিসারে অকস্মাৎ খালেদের ওপর আক্রমণ করবে। এরপর হুরমুয যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আসে, হযরত খালেদ তার ঘোড়া থেকে নেমে আসেন; হুরমুযও তার ঘোড়া থেকে নেমে আসে আর সে হযরত খালেদকে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান জানায়। হযরত খালেদ পায়ে হেঁটে তার কাছে আসেন আর উভয়ের মধ্যে লড়াই হয়। উভয়ের পক্ষ আঘাত হানতে থাকে। হযরত খালেদ হুরমুযকে চেপে ধরে। তখন হুরমুযের রক্ষীবাহিনীবিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত খালেদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে ঘিরে ফেলে।একক যুদ্ধে অন্যরা আক্রমণ করে না। কিন্তু যাহোক হুরমুযের সেনারা খালেদের ওপর আক্রমণ করে বসে। এতদসত্ত্বেও হযরত খালেদ হুরমুযের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন।

ইরানীদের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দেখামাত্রই হযরত কা'কা বিন আমর হুরমুযের রক্ষীবাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন আর তাদেরকে ঘিরে ফেলে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেন। ইরানীরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় এবং পালিয়ে যায়। পলায়নকারীদের মধ্যে কুবায এবং আনুশেজানও ছিল। মুসলমানরা রাতের অন্ধকারে ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবন করে আর ফুরাত নদীর বড় সেতু পর্যন্ত তাদের হত্যা করতে থাকে যেখানে বর্তমানে বসরার বসতি গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ শেষ হলে হযরত খালেদ (রা.) মালে গনিমতজড়ো করান। এর মধ্যে একটি উটের বোঝার সমপরিমাণ শিকলও ছিল। যার ওজন এক হাজার রাতল ছিল। অর্থাৎ, শিকলের ওজন ছিল প্রায় তিনশ' পঁচাত্তর কেজি। যেসব গনিমতের মাল হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হয় তাতে হুরমুযের একটি টুপিও ছিল। যার মূল্য এক লক্ষ দিরহাম ছিল আর তা মূল্যবান মণিমুক্তায় খচিত ছিল।হযরত আবু বকর (রা.) এই টুপিটি হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ, মালে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদেরখুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ এবং একটি হাতি মদিনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন আর ইসলামী সেনাবাহিনীর বিজয়ের সংবাদ তিনি (রা.) সবদিকে ঘোষণা করিয়ে দেন। যির বিন কুলায়েব (রা.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ এবং হাতি নিয়ে মদিনায় পৌঁছেন। মদিনাবাসীর ইতঃপূর্বে কখনোই হাতি দেখার সুযোগ হয়নি। কেবল মদিনাবাসীই নয় আরবের অন্য কোন অধিবাসীও তখন পর্যন্ত আবরার হাতিগুলো ছাড়া হাতির চেহারাও দেখেনি। লোকদেরকে দেখানোর জন্য একে শহরজুড়ে ঘুরানো হলে বৃদ্ধ এক মহিলা এই হাতিটি দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে বলে, আমরা যা দেখছি তাও কি আল্লাহ্ তা'লার কোন সৃষ্টি? তারা মনে করছিল, এটি হয়তো কোনো কৃত্রিম জিনিস। হযরত আবু বকর (রা.) যিরের হাতেই এই হাতিকে হযরত খালেদ (রা.)-এর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১০) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৪০৪-৪০৫) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- হ্যায়কাল, পৃ: ২৭১-২৭৩) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৯) (লুগাতুল হাদীস, 'রাতাল' শব্দের অর্থ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২১)

এই যুদ্ধে বিজয় লাভের একটি বড় কারণ ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর সেই কর্মপন্থা যা তিনি ইরাকের কৃষকদের জন্য গ্রহণ করেছিলেন আর হযরত খালেদ (রা.) কঠোরভাবে এর অনুসরণ করেছিলেন। এই কর্মপন্থার অধীনে তিনি (রা.) কৃষকদের প্রতি কোন প্রকার বিরোধ প্রদর্শন করেননি। যেখানে যেখানে তাদের বসতি ছিল তাদেরকে সেখানেই থাকতে দিয়েছেন আর জিযিয়ার সামান্য অর্থ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের জরিমানা বা কর আদায় করেন নি।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৭২, অনুবাদক- মহম্মদ আহমদ শেখ পানিপতি)

যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরোহী যোদ্ধাদের এক হাজার দিরহাম দেয়া হয় এবং পদাতিক সৈন্যদেরকে এর এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১)

কাযেমার যুদ্ধটি সুদূরপ্রসারী ফলফল বহনকারী প্রমাণিত হয়েছে।
এ যুদ্ধটি মুসলমানদের চোখ খুলে দেয় আর তারা দেখেছে যে, সেই ইরানী যাদের সামরিক শক্তির সুখ্যাতি সুদীর্ঘকাল থেকে প্রচারিত হয়ে আসছিল তারা তাদের পূর্ণ শক্তিসামর্থ্য সত্ত্বেও তাদের ছোট্ট একটি সেনাদলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। এই যুদ্ধে যে পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের হস্তগত হয়েছে তারা এর কল্পনাও করতে পারত না।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৭২, অনুবাদ শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতি)

এরপর 'উবুল্লা'র যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এটি বারো হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ (রা.)-কে উবুল্লা থেকে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করতে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন;এটি পারস্য উপসাগরের একটি উপকূলীয় জায়গা ছিল। ইরাক থেকে ভারতবর্ষ এবং সিন্ধুতে যে বাণিজ্যিক কাফেলা আসত তারা সর্বপ্রথম উবুল্লায় অবস্থান করত। উবুল্লার বিজয় সম্পর্কে দুটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হলো, মুসলমানরা সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে উবুল্লা জয় করে কিন্তু পরবর্তীতে এটি পুনরায় ইরানীদের দখলে চলে যায় আর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর যুগে মুসলমানরা একে পুর্ণরূপে দখল করে নেয়। দ্বিতীয় রেওয়ায়েটি হলো, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে এটি জয় হয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক আকবর, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৬৯)

যাহোক, আল্লামা তাবরী তার পুস্তকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালের প্রেক্ষাপটে এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাদিয়েছেন। তথাপি এরপর তিনি লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে উবুল্লার বিজয়ের কাহিনী সাধারণ জীবনীকারদের ধ্যানধারণা ও সঠিক রেওয়ায়েতগুলোর পরিপন্থী। কেননা উবুল্লার বিজয় হযরত উমর (রা.)-এর যুগে চৌদ্দ হিজরী সনে হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর হাতে অর্জিত হয়েছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০)

ইতিহাসের অন্যান্য পুস্তকে উবুল্লা যুদ্ধের উল্লেখ এভাবে এসেছে যে, কোনো কোনো ইতিহাসবিদ এটি প্রথমবার হযরত আবু বকর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ এ যুদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে নয় বরং হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) উভয়ের কল্যাণময় যুগেই উবুল্লার যুদ্ধ এবং উবুল্লার বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রথমবার এর বিজয় হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে কিন্তু পরবর্তীতে ইরানীদের সামুদ্রিক সহায়তায় উবুল্লাবাসীরা বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা অর্জন করে নেয়। এরপর হযরত উমর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে পুনরায় এর বিজয় হয়।

(আস সিদ্দীক, প্রণেতা-প্রফেসর আলি মহসিন সিদ্দীকি, পৃ: ১২৮)

যাহোক, উবুল্লা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হলো, যাতুস্ সালাসিলের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ(রা.) হযরত মুসান্না (রা.)-কে ইরানের পরাজিত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং একই সাথে হযরত মা'কেল (রা.)-কে উবুল্লা প্রেরণ করেন যেন তিনি সেখানে পৌঁছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্র করেন এবং বন্দিদের গ্রেফতার করেন। অতএব মা'কেল সেখান থেকে যাত্রা করে উবুল্লায় পৌঁছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং বন্দিদের একত্র করেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০)

পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর কল্যাণময় যুগে এর বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত উমর (রা.) হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-কে চৌদ্দ বা ষোল হিজরী সনে বসরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। হযরত উতবা (রা.) সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। উবুল্লার অধিবাসীরা তারমোকাবিলায়বের হয়। উবুল্লার সুরক্ষায় পাঁচ শত অনারব সৈন্য নিয়োজিত ছিল। হযরত উতবা (রা.)তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। এভাবে ইরানীরা শহরের ভিতর ঢুকে পড়ে আর হযরত উতবা (রা.) নিজ সেনাবাহিনীতে ফিরে আসেন। আল্লাহ্ তা'লা পারস্যবাসীদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চারণ করেন। তারা শহর ছেড়ে অল্প

কিছু মালপত্র নিয়ে নৌকায় চেপে নদী পাড়ি দিয়ে চলে যায়। এভাবে পুরো শহর খালি হয়ে যায় আর মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করে। এখানে মুসলমানরা বিপুল পরিমাণে সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য সামগ্রী ও বন্দিও হস্তগত হয়। এই সমস্ত মালপত্রের পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়। মুসলমানদের সংখ্যা তিন শত ছিল।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৫)

তারপর আরেকটি যুদ্ধ হলো 'মাযার'-এর যুদ্ধ। মাযারের যুদ্ধ বারো হিজরী সনের সফর মাসে সংঘটিত হয়। বারো হিজরী সনে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১)

মাযার মেয়সান এলাকার একটি ছোট শহর। মাযার এবং বসরার মাঝে চার দিনের সমপরিমাণ দূরত্ব রয়েছে।

(মুজামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

এই ঘটনার দিন লোকদের মুখে মুখে এই বাক্যই ছিল যে, সফর মাস এসে গেছে আর এতে নদীর মোহনায় প্রত্যেক অত্যাচারী বিদ্রোহী নিহত হবে। হুরমুয যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বিপরীতে ছিল। সে তার বাদশাহকে সাহায্যের জন্য লিখেছিল। বাদশাহ তার সাহায্যের জন্য কারিনের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল প্রেরণ করে। কিন্তু সেই সৈন্যদল মাযার পৌঁছামাত্রই যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে হুরমুযের পরাজিত ও নিহত হওয়ার সংবাদ পায়। এরই মাঝে হুরমুযের পরাজিত সৈন্যদল মাযারে গিয়ে কারিনের সাথে মিলিত হয়। তাদের কোনো কোনো সৈন্যদলের সৈনিকরা অন্য দলের সৈনিকদের বলে, তোমরা যদি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও তবে আর কখনো একত্রিত হতে পারবে না। তাই একেবারে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। পলায়নপর সৈন্যবাহিনী এবং ইরান থেকে আগত নতুন সেনাসাহায্য তথা উভয় দল একত্রিত হয়। এই উভয় দল পরস্পরকে এই বলে উদ্দীপ্ত করে যে, যুদ্ধ হওয়া উচিত। যারা পলাতক সৈন্যবাহিনী ছিল তারা বলে, বাদশাহর পক্ষ থেকে সাহায্য হিসেবে প্রেরিত নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁছেছে আর এ হলো তার সেনাপতি কারিনযে আমাদের সাথে আছে। হতে পারে খোদা তা'লা আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আমাদের শত্রুদের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিবেন আর আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার কিছুটা লাঘব হবে। সুতরাং তারা এমনই করে। তারা মাযারে শিবির স্থাপন করে। কারিন যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া কুবায ও অনুশেজানকে সম্মুখ সেনাদলে নিযুক্ত করে। অপরদিকে হযরত মুসান্না ও হযরত মুআন্না শত্রুদের এই প্রস্তুতির সংবাদ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-কে পাঠিয়ে দেন। হযরত খালেদ (রা.) কারিনের সংবাদ পাওয়ামাত্রই যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সেসব মুজাহিদের মাঝেই বণ্টন করে দেন যাদেরকে খোদা তা'লা তা দান করেছিলেন। এছাড়া এক-পঞ্চমাংশ হতে আরো যতটা চান দেন। যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে অর্জিত অবশিষ্ট মালে গনিমত এবং এই যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। আর এই বিষয়েও অবহিত করেন যে, যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদল এবং কারিনের নেতৃত্বে আগত নতুন সেনাদল একস্থানে সমবেত হচ্ছে। অতএব হযরত খালেদ যাত্রা করে মাযারে কারিনের সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য পৌঁছান। এরপর তিনি (রা.) তার সেনাদলের সারিগুলো ঠিক করেন। উভয় দল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উভয় পক্ষের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। কারিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়। অপরদিক থেকে তার মোকাবিলার জন্য হযরত খালেদ এবং হযরত মা'কেল বিন আশা (রা.) সামনে অগ্রসর হন। তারা উভয়ে কারিনের ওপর ঝাঁপি য়ে পড়েন।কিন্তু হযরত মা'কেল হযরত খালেদের পূর্বেই গিয়ে কারিনকে ধরে ফেলেন ও তাকে হত্যা করেন। হযরত আসেম, অনুশেজানকে এবং হযরত আদী, কুবাযকে হত্যা করেন। এই তিন নেতার নিহত হওয়ায় ইরানীরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে থাকে। এই যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর বিরাট একটি সংখ্যা নিহত হয়। আর যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল তারা তাদের নৌকায় চড়ে পালিয়ে যায়। হযরত খালেদ মাযার-এ অবস্থান করেনএবং প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র, তা যত মূল্যমানেরই হোক না কেন, সেই মুজাহিদকেই প্রদান করেন যিনি তাকে হত্যা করেছেন। সেইসাথে তিনি 'ফায়'ও (অর্থাৎ একধরনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন এছাড়া 'খুমুস' থেকেও সেসব যোদ্ধাদের ভাগ দেন যারা অসাধারণ অবদান রেখেছে। আর 'খুমুস'-এর অবশিষ্টাংশ একটি প্রতিনিধিদলের সাথে হযরত সাঈদ বিন নো'মানের তত্ত্বাবধানে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এই যুদ্ধে ত্রিশ হাজার ইরানী নিহত হয়েছিল, আর যারা নদীতে ডুবে মারা গিয়েছিল তাদের হিসাব এর বাইরে। বলা হয়ে থাকে, এই পানি যদি বাধা না হতো তবে তাদের মধ্য থেকে একজনও রেহাই পেত না। তদুপরি যারা পালিয়ে বেঁচেছিল তারা একদম বিশৃঙ্খল অবস্থায়, নিজেদের সবকিছু ফেলে পালিয়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং ইরানী বাহিনীকে সহায়তা প্রদানকারীদেরকে পরিবারপরিজনসহ বন্দি করা হয়। এসব বন্দির ভিতর আবুল হাসান বসরীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবুল হাসান বসরী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তিনি ইমাম হাসান বসরীর পিতা ছিলেন যিনি বসরার প্রসিদ্ধ বক্তা ও সুফী ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, আবুল হাসান বসরীকে বন্দি করার পর মদিনায় আনা হয় যেখানে তার মনিব তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১১, ৩১২) (উর্দু দায়েরাহ মারেফুল ইসলামিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৬২)

এই বিজয়ের পর সাধারণ জনগণের প্রতি অত্যন্ত কোমল আচরণ করা হয়। কৃষকসহ সেসমস্ত লোকজনদের কোনরকম কষ্ট না দিয়ে শুধুমাত্র জিযিয়া প্রদানে সম্মত করা হয় এবং তাদেরকে তাদের নিজস্ব জমি-জমায় থাকতে দেওয়া হয়। এসব প্রাথমিক কাজ শেষ করে হযরত খালেদ বিজিত অঞ্চলের শাসন-শৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগ দেন।

জিযিয়া আদায় করার জন্য স্থানে স্থানে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বিজিত অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য তিনি হাফীর ও 'জিসরে আযম' বা সবচেয়ে বড় পুল অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করে রেখেছিলেন; সেই ব্যবস্থাপনা আরো সুসংগঠিত করা হয় এবং সেনাবাহিনীর প্রতিটি দলকে বিভিন্ন অফিসারের তত্ত্বাবধানে দিয়ে তাদেরকে শত্রুর গুপ্ত ও প্রকাশ্য গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকার ও প্রয়োজনে তাদের মোকাবিলা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। হযরত খালেদের রণনৈপুণ্যের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, ইরানের ভূখণ্ডে তার অগ্রাভিযানের শুরু থেকেই কিসরার শক্তিশালী বাহিনী পরাজিত হতে আরম্ভ করে এবং তাদের প্রবল সংকল্প, বিক্রম ও উদ্দীপনা পুরোপুরি শীতল হয়ে যায়।

মাযার-এর যুদ্ধ হীরার অদূরেই সংঘটিত হয়েছিল। হীরা উপসাগর ও মাদায়েন-এর প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৭৫, অনুবাদক-মহম্মদ আহমদ পানিপতি)

যুদ্ধ-পরবর্তী কর্মকাণ্ড শেষ হলে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ শত্রুদের গতিবিধি জানার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১২)

পাছে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে পুনরায় সংগঠিতসংঘবদ্ধ হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি।

আরেকটি যুদ্ধ হলো'ওয়ালাজা'-এর যুদ্ধ। ওয়ালাজার যুদ্ধ দ্বাদশ হিজরির সফর মাসে সংঘটিত হয়। ওয়ালাজা, কাসকারের নিকটবর্তী একটি শুষ্কভূমির অঞ্চল। মাযারের যুদ্ধে ইরানীদেরকে যে লজ্জাজনক পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা হলো, তাতে তাদের বড় বড় নেতারাও নিহত হয়েছিল। একারণে পারস্যসম্রাট নতুন এক কৌশল অবলম্বন করে এবং অধিক প্রস্তুতির সাথে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যেমন, ইরানী সরকার ইরাকে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের অত্যন্ত বৃহৎ একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েল-এর নেতৃস্থানীয় লোকদের ইরানী রাজদরবারে ডেকে পাঠায় এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সম্মত করে একটি সৈন্যদল প্রস্তুত করে ও সেই সেনাদলের নেতৃত্ব এক সুপ্রসিদ্ধ অশ্বারোহী আন্দারযাবার-এর হাতে অর্পণ করে। আর এই সৈন্যবাহিনী ওয়ালাজা অভিমুখে যাত্রা করে। ইরাকে খ্রিষ্টানদের অনেক বড় একটি গোত্র বকর বিন ওয়ায়েলের বসতি ছিল। সম্রাট আর্দশীর তাদেরকে ডেকে পাঠায় এবং তাদের একটি সেনাদল প্রস্তুত করে তাদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ওয়ালাজা অভিমুখে প্রেরণ করে। হীরা ও কাসকার-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকজন এবং কৃষকরাও এই সৈন্যদলের সাথে যোগ দেয়। হীরা কুফা থেকে ৩ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর। কাসকার কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি উপশহর ছিল। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, মুসলমানদের ওপর বিজয়ের বরমাল্য যেন সম্পূর্ণরূপে আরবের খিষ্টানরা লাভ করতে না পারে সেজন্য তাদের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি বাহমান জাযভ্যা-কেও একটি বিশাল সৈন্যদলের সাথে তাদের পিছনেই রওয়ানা করে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১২) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীকে আকবার, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৮৭-২৮৮)

যখন এই পারস্য নেতার এটি অনুভব হয় যে, তার সৈন্যবাহিনী অনেক বড় আকার ধারণ করেছে তখন সে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ-

এর ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)যখনওয়ালাজা অঞ্চলে পারস্য সেনাবাহিনীর একত্রিত হবার সংবাদ পান তখন তিনি বসরার নিকটে ছিলেন। তিনি এটিই সমীচীন মনে করেন যে, পারস্য সেনাবাহিনীর ওপর তিন দিক হতে আক্রমণ করা উচিত যেন তাদের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং এভাবে অতর্কিত আক্রমণের ফলে পারস্য সেনাবাহিনীতে অস্থিরতা ছেয়ে যায়।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবি, পৃ: ৪০৬)

সুতরাং তিনি সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন আর তাকে হাফীরেই অবস্থানের জন্য নির্দেশ প্রদান ক রেন এবং তাদের নিকট পৌঁছেন যাদেরকে দাজলার নিম্নাঞ্চলে রেখে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান ক রেন যে, শত্রুপক্ষ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং অলসতা ও ধোঁকায় নিপতিত হবেনা। আর নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি ওয়ালাজার দিকে অগ্রসর হন এবং শত্রুবাহিনী ও তাদের সাহায্যকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সৈন্যবাহিনীর উভয়পাশে মুসলিম যোদ্ধাদের নিযুক্ত রেখেছিলেন যারা আক্রমণের জন্য ওঁত পেতে ছিল। পরিশেষে ওঁতপেতে থাকা উভয় সৈন্যদল উভয় দিক হতে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ রচনা করে। ইরানী সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। কিন্তু হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সম্মুখ থেকে এবং ওঁত পেতে থাকা উভয় সৈন্যদল পিছন দিক হতে তাদেরকে এমনভাবে ঘেরাও করে যে, তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের কারো আপন সঙ্গী-সাথীর নিহত হওয়ারও কোনো পরোয়া ছিল না। শত্রুবাহিনীর সেনাপতি পরাজিত হয়ে অবশেষে নিহত হয়। কৃষকদের সাথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ সেই আচরণই করেন যা তাঁর পদ্ধতি ছিল, অর্থাৎ তাদের কাউকেই হত্যা করেননি। কেবলমাত্র যুদ্ধবাজ লোকদের সন্তান ও তাদের সাহায্যকারীদেরকে গ্রেফতার করেন এবং দেশের সাধারণ জনগণকে কর প্রদান করার ও জিম্মী হিসেবে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান, যা তারা গ্রহণ করে নেয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১২)

এরপর 'উলায়েস'-এর যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। উলায়েসের যুদ্ধ ১২ হিজরী সনের সফর মাসে সংঘটিত হয়। উলায়েসও ইরাকের আনবার প্রদেশের জনপদসমূহের মধ্যে একটি জনপদ ছিল। হযরত খালেদের হাতে ওয়ালাজার যুদ্ধের দিন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র ও ইরানীদের আরো একটি শোচনীয় পরাজয়ের কারণে তাদের স্বজাতি খ্রিষ্টানরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। তারা ইরানীদেরকে এবং ইরানীরা তাদেরকে চিঠি লিখে এবং সবাই উলায়েস নামক স্থানে একত্রিত হয়। আব্দুল আসওয়াদ ইজলী তাদের নেতা নিযুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ইরানী বাদশাহ বাহমান জাযভ্যা-কে চিঠি লিখে যে, তুমি তোমার সৈন্যবাহিনী নিয়ে উলায়েসে পৌঁছ এবং পারস্য ও আরব খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা সেখানে সমবেত আছে তাদের সাথে মিলিত হও; কিন্তু বাহমান জাযভ্যা স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর সাথে যায়নি, বরং সে তার স্থ লে আরেকজন প্রসিদ্ধ বীর জাবানকে প্রেরণ করে এবং তাকে নির্দেশ প্রদান করে যে, মানুষের হৃদয়ে যুদ্ধের স্পৃহা সৃষ্টি করো, কিন্তু আমি না আসা পর্যন্ত শত্রুপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, যদি না তারা স্বয়ং যুদ্ধ আরম্ভ করে। জাবান উলায়েস অভিমুখে রওয়ানা হয়। বাহমান জাযভ্যা স্বয়ং ইরানী বাদশাহ্ আর্দশীরের নিকট পরামর্শ করার জন্য যায়। কিন্তু এখানে এসে দেখে যে, বাদশাহ অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে। এজন্য বাহমান জাযভ্যা তার সেবা-শুশ্রূষায় রত হয়ে যায় এবং জাবানকে কোন নির্দেশনা প্রেরণ করেনি। জাবান একাকী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে রনাঙ্গণ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে সফর মাসে উলায়েস-এ পৌঁছে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৪)

বিভিন্ন গোত্র ও হীরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আরব খ্রিষ্টানরা জাবানের নিকট সমবেত হয়। হযরত খালেদ যখন এসব খ্রিষ্টান সৈন্যদলের একত্রিত হবার সংবাদ পান তখন তিনি তাদের মোকাবিলা করার জন্য বের হন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, জাবানও নিকটে চলে এসেছে। হযরত খালেদ কেবলমাত্র সেসকল আরব ও খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে এসেছিলেন, কিন্তু উলায়েস-এ জাবানের মুখোমুখি হতে হয়। জাবান যখন উলায়েস-এ পৌঁছে তখন অনারবরা জাবানকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনার মতামত কী? আমরা কি প্রথমে তাদের খবর নিব নাকি লোকজনকে খাবার খাওয়াব? অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করব নাকি আগে খাবার খেয়ে নিব? আর খাবার শেষ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করব? জাবান বলে যে, শত্রুরা যদি তোমাদের প্রতিবন্ধক না হয় তাহলে তোমরাও নিশ্চুপ থাক। কিন্তু আমার ধারণা হলো, তারা তোমাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করবে আর তোমাদেরকে খাবার খেতে দিবে না। তারা জাবানের কথা না মেনে খাবারের জন্য দস্তরখান বিছিয়ে দেয়। খাবার পরিবেশন করা হয়। আর সবাইকে ডেকে তারা খাদ্য গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৪১)

হযরত খালেদ শত্রুর মোকাবিলায় এসে থেমে যান। জিনিসপত্র নামানোর নির্দেশ দেন। উক্ত কাজ শেষে শত্রুদের প্রতি মনোযোগী হন। হযরত খালেদ সেনাবাহিনীর পিছন দিকের সুরক্ষার জন্য সুরক্ষাকারী দল নিযুক্ত করেন আর শত্রুসারির দিকে অগ্রসর হয়ে মোকাবিলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আবজার কোথায়? আব্দুল আসওয়াদ কোথায়? মালেক বিন আয়েস কোথায়?মালেক ছাড়া বাকি সবাই ভীরুতার কারণে নিশ্চুপ থাকে। মালেক তার মোকাবিলায় বের হয়। হযরত খালেদ তাকে বলেন, তাদের সবার মাঝ থেকে আমার মোকাবিলায় বের হতে কীসে তোমাকে সাহস জুগিয়েছে?তোমার মাঝে আমার মোকাবিলা করার সামর্থ্য নেই। একথা বলে তিনি তার ওপর আঘাত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। অনারবদেরকে তাদের কিছু খাওয়ার পূর্বেই দস্তরখান থেকে উঠিয়ে দেন। জাবান তার লোকদের বলে, আমি কি তোমাদেরকে পূর্বে বলিনি যে, খাবার আরম্ভ কোরো না। খোদার কসম, কোনো সেনাপতির কারণে আমি এতটা ভীত হইনি যেমনটি আজ এই লড়াইয়ে হচ্ছি। তারা যখন খাবার খেতে সমর্থ হয়নি তখন নিজেদের বীরত্ব দেখানোর জন্য বলতে থাকে যে, আপাতত আমরা খাবার রেখে দিচ্ছি যতক্ষণ না আমরা মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করে নেই। এরপর আমরা খাবার খেয়ে নিব। জাবান বলে, খোদার কসম, আমার ধারণা হলো, তোমরা এই খাবার শত্রুদের জন্য রেখে দিয়েছ। অর্থাৎ এটি মনে কোরো না যে, তোমরা বিজয়ী হবে আর এরপর খাবার খেতে পারবে। বরং আমার মনে হচ্ছে এই খাবার এখন তোমাদের শত্রুরাই খাবে, অর্থাৎ মুসলমানরা-ই খাবে যা তোমরা বুঝতে পারছ না। তখন সে লোকজনকে বলে, এখন আমার কথা শোন আর এই খাবারে বিষ মিশিয়ে দাও। যদি তোমরা বিজয়ী হও তাহলেখাবার নষ্ট হওয়ার এই ক্ষতিঅতি সামান্য। আর শত্রুরা যদি বিজয়ী হয় তাহলে এটি তোমাদেরএমন কাজ পরিগণিত হবে যাতে শত্রুরা বিপদে নিপতিত হবে। অর্থাৎ বিষাক্ত খাবার খাওয়ার করণে। কিন্তু তারা নিজেদের বিজয়ী হওয়ার বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল। তারা বলে যে, না- এর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বিষ মিশানোর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা সহজেই যুদ্ধে বিজয়ী হব এবং এরপর খাবার খাব। হযরত খালেদ নিজ বাহিনীর সারি সেভাবে বিন্যস্ত করেন যেমনটি তিনি এর পূর্বের লড়াইগুলোতেও করেছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে থাকে। ইরানীদের বাহমান জাযভ্যা-এর আগমনের আশা ছিল। তাই তারা পূর্ণোদ্যমে প্রচণ্ড লড়াই করতে থাকে। কেননা জাবান তাদেরকে এই আশা দিচ্ছিল যে, সে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছে আর এখনই পৌঁছাতে যাচ্ছে। অথচ বাস্তবতা ছিল এই যে, ইরানী বাদশাহর অসুস্থ হওয়ার কারণে বাহমান বাদশাহ্‌র কাছে পুরো পুরিস্থিতি বর্ণনা করারও সুযোগ পায়নি আর সে নিজেও সেনাবাহিনী নিয়ে আসতে পারতো না। বরং জাবানের সাথে তার কোন প্রকার যোগাযোগও ছিল না। যাহোক, এই যুদ্ধে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে অনেক উত্তেজিত ও উদ্দীপ্তছিল আর তুমুল যুদ্ধ হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

ইরানী বাহিনীর উচ্ছ্বাস ও উদ্যম এবং মুসলমানদের দুর্বল হতে থাকা অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জীবনীকার লিখেন যে, ইরানী বাহিনীর মধ্য থেকে প্রথমে খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করে। কিন্তু তাদের সর্দার মালেক বিন কায়েস নিহত হয়। তার নিহত হতেই তাদের মনোবল হারিয়ে যায় আর তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

এটি দেখে জাবান ইরানী বাহিনীকে সামনে এগিয়ে দেয়। বাহমান নতুন সাহায্য নিয়ে আসতে যাচ্ছে, ইরানীরা এই আশায় অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। মুসলমানরা বার বার আক্রমণ করে। কিন্তু প্রতিবার ইরানীরা পরম বীরত্ব ও অবিচলতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করেঅবশেষে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ জাগতিক উপায় উপকরণ ও মাধ্যমসমূহকে অকার্যকর দেখে একান্ত বিনয়ের সাথে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন এবং নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাকে শত্রুর ওপর বিজয় দান করো তাহলে আমি শত্রুদের মাঝে কাউকে রেহাই দিব না এবং এই নদী তাদের রক্তে লাল হয়ে যাবে। কতক পুস্তকে লেখা আছে, হযরত খালেদ (রা.) শপথ করেছিলেন অথবা মানত করেছিলেন যে, এ যুদ্ধে যদি বিজয় লাভ হয় তাহলে কোনো যুদ্ধবাজ শত্রুকে জীবন্ত ছাড়ব না। মোটকথা, এরপর হযরত খালেদ (রা.) রণকৌশলের অংশ হিসেবে সৈন্যদেরকে ডান ওবাম দিক থেকে গিয়ে ইরানী সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগে আক্রমণ করার আদেশ দেন। এই আক্রমণের ফলে ইরানী সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আর

পলায়ন করা অথবা অস্ত্র সমর্পণ করার মাঝেই তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিহিত বলে মনে করে। হযরত খালেদ (রা.) আদেশ দিলেন যে, শত্রুকে ধরে বন্দিকরো আর যারা যুদ্ধ করতে উদ্যত তাদের বৈ অন্য কাউকে হত্যা কোরো না।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীক আকবার, পৃ: ৬৭১-৬৭২) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৪)

কেবল তাদেরকেই হত্যা করবে যারা মোকাবিলা করবে। এ বিষয়ে এক রিসার্চ সেল (তথা কেন্দ্রীয় গবেষণা কমিটির) নোট আছে আর আমিও দেখেছি যে, আমার কাছে তা সঠিক মনে হয়েছে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তাবারীসহ অধিকাংশ জীবনীকারক এবং ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খালেদ (রা.) নিজের এই দোয়ায় যে শপথ করেছিলেন তদনুযায়ী এক দিন এবং এক রাত ঐসকল বন্দিদেরকে হত্যা করে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যেন তাদের রক্তে পানি রক্তবর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ তিনি কেবল যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধই করেন নি বরং বন্দিদেরকেও হত্যা করেন আর এ কারণে উক্ত নদী আজও 'নেহরুদ দাম' তথা রক্তের নদী নামে প্রসিদ্ধ।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

যা-ই ঘটে থাকুক,বন্দিদেরকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়ার বিষয়টি সঠিক মনে হয় না। জীবনীকারগণ কিছুটা অতিশয়োক্তি বাভুলক্রুটির শিকার হয়েছেন। খুবসম্ভব সেসব মস্তিষ্ক যারা ইসলামী যুদ্ধসমূহে জেনেশুনে অত্যাচার এবং বর্বরতার মিথ্যা কাহিনী যোগ করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছেন, তারা যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই নিজেদের পক্ষ থেকে এসব কল্পকাহিনী সংযুক্ত করে দিয়েছেন।

জীবনীকারদের মাঝে কতক শত্রুও ছিল। এমন শত্রুতা পোষণকারী অথবা বিদ্বেষ পোষণকারী যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো এমন কথা লিখে দিত, তারাই হয়তো লিখে দিয়ে থাকবে যে, বন্দিদেরকে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। যাহোক, বাহ্যতমনে হয় যে, (অতিরঞ্জিত) এমন কোনো কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে একথা উপস্থাপন করতে পারে যে, দেখ! মুসলমানরা কীভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে আর নিরস্ত্র বন্দিদেরকে হত্যা করা হয়েছে। যদিও প্রথম কথা হলো, বন্দিদেরকে হত্যা করা সেযুগের রীতিনীতি এবং চলমানযুদ্ধের রীতি অনুযায়ী কোনো আপত্তির বিষয় ছিল না কিন্তু ইসলামী যুদ্ধ আর বিশেষকরে মহানবী (সা.)-এর আশিসময় যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগের যুদ্ধসমূহে কার্যত এমন হয়ও নি যে, বন্দিদেরকে এভাবে (নির্বিচারে) হত্যা করা হয়ে থাকবে। যদিও ঐসকল যুদ্ধে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় নিহত হওয়ার কথা দেখা যায় কিন্তু তারা সবাই যুদ্ধ চলাকালীন সময় নিহত হয়েছিল। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর ন্যায় সেনাপতির যুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে দেখা যায় তিনিও যতদূর সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রত্যেক সেই ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন যে অস্ত্র সমর্পণ করেছে অথবা আনুগত্য স্বীকার করেছে আর যাকেই হত্যা করেছেন, জীবনীকারকদের কল্পকাহিনী রচনা সত্ত্বেও অনুসন্ধানে তাকে হত্যা করার বস্তুনিষ্ঠ কারণ পাওয়া গেছে। মোটকথা, এই ঘটনাকে যদি দেখা হয় তাহলে এটি কিছুটা মনগড়া কেচ্ছাকাহিনী মনে হয় কেননা ইতিহাসবেত্তা এবং জীবনীকারক যারা এ জায়গাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন আর এক্ষেত্রে প্রত্যেক সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত ঘটনা আদৌ উল্লেখই করেননি; আর এটি এ কথা সাব্যস্ত করে যে, সেগুলো ছিল মনগড়া কথা। একজন মুক্তমনা লেখক যিনি খুব স্বাধীনভাবে ইতিহাস বর্ণনা করে থাকেন, তিনি এমন অনেক আপত্তিকর কথাও বর্ণনা করে থাকেন, যার সাথে একমত হওয়া যায় না, তিনিও এই ঘটনা উল্লেখ করার পর লিখেন যে,রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীরা এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করে সীমাতিরিক্ত অতিশয়োক্তি করেছেন। এটি নিশ্চিত যে, খালেদ (রা.) ইসলামের শত্রুদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছেন, যা দেখে কা'কা (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা নীরব থাকতে পারেননি।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীকে আকবর, অউর হযরত ফারুক আযাম, প্রণেতা- ডক্টর তৃহা হোসেন-পৃ: ৮৫-৮৬)

অর্থাৎ বন্দিদের সাথে কঠোরতা করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু হত্যা করা হয়েছিল কথাটি ভুল। একইভাবে আরেক লেখক এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যা থেকে বুঝা যায়, সত্যিকারার্থে ইরানীদের হত্যা করে নদীতে ফেলা হয়নি।

যেমন, তিনি লিখেন, হযরত খালেদ ক্ষীপ্রতার সাথে হামলা করে এমনভাবে খ্রিষ্টানদের হত্যা করেন এবং ইরানী সারিগুলোকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করেন যেন তারা মৃৎ নির্মিত ছিল রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। যেহেতু ইরানী অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাই তারা অর্ধচন্দ্রের মত বৃত্ত করে মুসলমানদের ঘিরে ফেলেছিল। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তা হলো, মুসলমানদের চারিদিকে ইরানী এবং খ্রিষ্টান আরব ছিল আর গভীর উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু মুসলমানরা যে উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছিল তা খ্রিষ্টানদের মাঝে ছিল না।

প্রত্যেক মুসলমান রক্তপিপাসু সিংহে পরিণত হয়েছিল এবং ভয়ঙ্কর আক্রমণ করে খ্রিষ্টানদেরকে তৃণলতার ন্যায় টুকরো টুকরো করছিল। যদিও ইরানীরাও মুসলমানদেরকে শহীদ ও আহত করছিল কিন্তু মুসলমান খুব কমই মারা যাচ্ছিল। আর যারা আহত হতো তারা আরো উচ্ছাস-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করত। ইরানী এত ব্যাপকহারে মারা যাচ্ছিল যে, তাদের লাশে রণক্ষেত্র ভরে যায়। যেসমস্ত ইরানী আহত হতো তারা রণক্ষেত্র থেকে সরে যেত। মুসলমানরা এতটা রক্তপাত ঘটায় যে, তাদের কাপড়ে রক্ত জমাট বেধে যায়। খালেদ বিন ওয়ালিদেরও একই অবস্থা ছিল। ইরানীদের রক্তে ভূমি প্লাবিত হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত রক্ত পানির মত প্রবাহিত হতে থাকে। অবশেষে ইরানীরা পরাজিত হয় এবং তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য অবস্থায় পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং বহুদূর পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে হত্যা ও বন্দি করতে থাকে। ইরানীরা কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে এমনভাবে পলায়ন করে যে, তাদের সহস্র সহস্র সৈন্য নদীতে ডুবে যায়। ইরানীরা যখন অনেক দূরে চলে যায় তখন মুসলমানরা ফিরে আসে। এ যুদ্ধে সত্তর হাজার ইরানী নিহত হয়েছে। একশ আটত্রিশ জন মুসলমান শহীদ হন। যাহোক, ঐতিহাসিকরা এতেও অত্যন্ত বিস্মিত হয় যে, মুসলমানরা কীভাবে ইরানীদের এত বিশাল বাহিনীকে হত্যা করল!

(হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ, প্রণেতা- সাদিক হোসেন সিদ্দীকি, পৃ: ১৬১-১৬২)

একজন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, নদীর পানি লাল হওয়া সংক্রান্ত ঘটনা যদি সঠিকও মনে করা হয় তাহলে যাদের কারণে নদীর পানি রক্তলাল হয়ে যায় তা সেসমস্ত আহত সৈন্যদের ডুবার ফলেও হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে, এমন ঘটনায় কিছুটা অতিরঞ্জিতও করা হয়েছে যেকারণে ইসলামী যুদ্ধ এবং খালেদ বিন ওয়ালিদের সত্তার ওপর সূক্ষ্ম হামলাকারীরা সুযোগ পেয়েছে।

অথবা যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের ওপর হিংস্র পদ্ধতি অবলম্বনের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন কিন্তু বাহ্যত মনে হয় এটি কেবল অপবাদ মাত্র। শত্রুরা যখন পরাজিত হয়, তাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং মুসলমানরা তাদের পিছুধাওয়া করে ফিরে আসে তখন হযরত খালেদ খাবারের কাছে এসে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, আমি এই খাবার তোমাদেরকে দিচ্ছি, এটি তোমাদের জন্য কেননা মহানবী (সা.) যুদ্ধের সময় ময়দান ছেড়ে পলায়নপর শত্রুদের প্রস্তুতকৃত খাবার পেলে তিনি (সা.) তা সেনাবাহিনীর মাঝে বিতরণ করতেন। অতএব মুসলমানরা রাতের খাবার হিসেবে তা খেতে আরম্ভ করে। উলায়েসএর যুদ্ধে সত্তর হাজার শত্রুবাহিনী নিহত হয় যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

'আমগোয়শিয়া'-এর বিজয় সম্বন্ধে লেখা আছে, আমগোয়শিয়া-কে আল্লাহ্ তা'লা বার হিজরীর সফর মাসে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত করেছিলেন। আমগোয়শিয়া ইরাকের একটি জায়গা। হযরত খালেদ যখন

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, Murshidabad.

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাত

গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, যুক্তরাজ্যের মিড্ল্যান্ডসের(মধ্যাঞ্চল) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গসংগঠন) সদস্যদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছাত্রদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে নিজ কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ৬০ জন ছাত্র বার্মিংহামের দারুল বারাকাত মসজিদ থেকে এ সভায় যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশকিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।ছাত্রদের একজন হুযূর আকদাসকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে তাঁর স্মরণীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে স্মরণীয়। যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, তুমি তোমার তরুণ বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে স্মরণ করতে শুরু করবে। আমার স্মরণ আছে! যখন আমরা ইজতেমার আয়োজন করতাম, তা হত খোলা আকাশের নিচে এবং আমরা আমাদের নিজেদের তাঁবু নির্মাণ করতাম। সেগুলো এমন যথাযথভাবে প্রস্তুত তাঁবু হত না, যেমনটি আজকাল তোমরা এখানে ইউরোপে অথবা অন্যান্য স্থানে পেয়ে থাক; বরং এর স্থলে আমরা আমাদের বিছানার চাদর ব্যবহার করতাম। সুতরাং যখন বৃষ্টি হত, বৃষ্টির পানি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করত; কেননা তা জলরোধক (ওয়াটারপ্রুফ) ছিল না। আর তাই, সেই দিনগুলো আমাদের জন্য স্মরণীয় এবং আমরা সেই ক্যাম্পিংকে উপভোগ করতাম।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"এটি ছিল কেবল খোলা মাঠে কাজ চালানোর মত একটি ব্যবস্থা। (রাবওয়ায়) এমনকি ইজতেমার মূল মার্কিটিও (বড় তাঁবু) এখানকার মত জলরোধক হত না।

যদি বৃষ্টি হত, তাহলে ভাল ভেজাই ভিজতে হত! অতএব এভাবেই আমরা আমাদের দিনগুলোকে উপভোগ করতাম। ইজতেমাস্থলেই খাবার রান্না হত, আর আমরা আমাদের বালতিতে করে আমাদের খাবার সংগ্রহ করতাম। ১০ জন করে এক-একটি দল এক-একটি তাঁবুতে অবস্থান করত। এমনই ছিল সেই দিনগুলো যা আমার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।"

প্রশ্নকারীদের একজন উল্লেখ করেন যে, হুযূর আকদাস সৈয়দ তালে আহমদের স্মৃতিচারণ করে যে জুমুআর খুতবা দিয়েছেন তা তাদেরকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে; আর তিনি প্রশ্ন করেন যে, কীভাবে তার পক্ষেও সৈয়দ তালে আহমদের মত হয়ে হুযূর আকদাসের প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা কর। আর যদি তুমি আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করতে থাক, তাহলে তুমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে- যাদেরকে খলীফাতুল মসীহ্ ভালবাসেন। এটি অর্জনের জন্য, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, তিনি যেন মানুষকে বলে দেন যে, 'বল! যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর: তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।' এখানে 'আমার অনুসরণ কর' এর অর্থ হল মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করা। অতএব তোমার জানার চেষ্টা করা উচিত যে, মহানবী (সা.) কী বলেছেন আর তার কাজকর্ম কেমন ছিল, তিনি কোন্ বিষয়গুলোর অনুশীলন করতেন, আর কী কী আদেশ দিয়ে গেছেন, আর পবিত্র কুরআন একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য কী কী বলে। অতএব যখন তুমি আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করবে, তখন তোমাকে খলীফাতুল মসীহ্ ভালবাসবেন, এমনকি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকলে তোমাকে ভালবাসবে। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণের চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা কর।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান দেশটিতে কোনদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা; কেননা এর জনগণ আহমদীদেরকে নৃশংসভাবে নিপীড়ন করে চলেছে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি পাকিস্তানী উলামা বা তথাকথিত মোল্লারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে, তাহলে পাকিস্তানে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না; যদি না তারা ভাল আচরণ করে, উত্তম নৈতিকতার অনুশীলন করে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে মানবিক আচরণের জন্য সচেষ্ট হয়। যদি তারা অমানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে, পাকিস্তানে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা ১৯৫৩ সাল থেকে এটা দেখে আসছি, যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক হৈ চৈ এবং আন্দোলন ছিল। ১৯৫৩ সালে আহমদীদেরকে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু একইসাথে পাকিস্তানী আহমদীদের পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা ধারণ করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এখন ১৯৭০ এর দশকের সংবিধান সংশোধনীর পর এবং জিয়াউল হকের অধিকতর সংশোধনীর পর, আহমদীদেরকে এমনকি নিজেদের সন্তানদের নাম মুসলমানদের মত রাখার ওপর বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। আহমদীরা 'বিসমিল্লাহ্' বলতে পারেন না, আর 'আস্সালামু আলাইকুম' বলতে পারেন না। আর এরপর তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনকে আরও জোরদার করেছে।"

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"যদি আপনি পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকান, যখন থেকে (আহমদীদের ওপর) নিপীড়ন শুরু হয়েছে, তখন থেকে দেশে কোন শান্তি নেই। যখনই কোন রাজনৈতিক বা সামরিক সরকার আসে, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে আর (দেশের) নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে না। নিজেদের নাগরিকদের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। মোল্লারা সর্বকিছু নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। যতদিন তারা অনুতপ্ত না হবে, আমার মনে হয় না পাকিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে।"

ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষে কুরবানীর পশু জবাই করা প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রটির প্রশ্ন ছিল, কোন পশু জবাই করার পরিবর্তে কেউ কী দরিদ্রকে অর্থ অনুদান দিতে পারেন?

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"আমাদের কি আমাদের নিজস্ব শরীয়ত ও সুন্নাহ্‌র প্রচলন করা উচিত, নাকি মহানবী (সা.) যা করতেন তার অনুসরণ করা উচিত? তিনি সাধারণত ভেড়া কুরবানী করতেন। বিশ্বে এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছেন, যাদের মাংস খাওয়ার সুযোগ হয় না। এখানে ইউরোপে তোমাদের পক্ষে এটি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যারা এখানে ইউরোপে অথবা পশ্চিমা দেশগুলোতে বা ধনী দেশগুলোতে বাস করেন, তারা তাদের (ঈদের) পশু কুরবানী সেসব এলাকায় করতে পারেন যেখানে দরিদ্র বেশি।" হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"একবার যখন আমি একজনকে আফ্রিকার কোন এক গ্রামে কিছু ছাগল কুরবানী করার জন্য বলি, তখন আমি পরবর্তীতে যারা মাংস পেয়েছিল তাদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া পাই যে, 'আমরা তিন বা চার বছর পরে মাংস দেখলাম এবং মাংস খেলাম!' যদি তোমার যথেষ্ট অর্থ থাকে, তাহলে ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীর পরও তুমি গরীবদেরকে অর্থ সদকা করতে পার। কিন্তু ঈদের জন্য, তোমাকে মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করতে হবে।"

একজন ছাত্র উল্লেখ করেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাকে যুগের প্রকৃত ইমাম হিসেবে গ্রহণ করবে; আর তাই, হুযূর আকদাসের কাছে তার প্রশ্ন, সেই সময় কখন আসার সম্ভাবনা আছে? হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, মূসায়ী মসীহ্‌কে (বৃহৎ পরিসরে) গ্রহণ করতে প্রায় ৩০০ বছর বা ততোধিক সময় লেগেছিল যখন রোম-সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, তোমরা দেখবে যে, ৩০০ বছর অতিবাহিত হবে না, এর পূর্বে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে সত্যিকার ইসলামরূপে গ্রহণ করবে।"

ভবিষ্যদ্বাণীটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন: "কিন্তু এসব কিছু আমাদের আমল এবং কর্মের ওপর নির্ভরশীল; আমরা আমাদের আমল ও কর্মে সঠিক পথে আছি কিনা; আমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসরণ করছি কিনা; আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি কিনা; যদি আমরা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাই, এটি সেই সময়ের পূর্বেই সংঘটিত হতে পারে। অতএব তুমি এর জন্য কী করছ? নিজের দিকে দৃষ্টি দাও। আমাদের নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং দেখা উচিত যে, আমরা সারা পৃথিবীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়ার বিষয়ে কী করছি। যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে আমাদের আমল ও কর্ম যথাযথ মানের হয় এবং মানবজাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়, তাহলে সেই সময়ের পূর্বেই আমরা এ লক্ষ্য অর্জন করব।"

২য় পাতার পর.....

হাদীসটির ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়।

উত্তর: হাদিস ব্যাখাকারীরা এই হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। ইবনে আরবী বলেন, হাদীসে এই জিনিসগুলি অপয়া হওয়ার সঙ্গে যে সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে তা তাদের গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। এছাড়া একথাও বলা হয়েছে যে, এই হাদীস দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে যদি কোনও বস্তুতে অকল্যাণ থাকতে পারে তবে তা তিনটি বস্তুতে। অনরূপভাবে একথাও বলা হয়েছে যে, যে-মহিলার সন্তান হয় না এবং যে ঘোড়া যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় না এবং যে গৃহের প্রতিবেশী দুরাচারী, সেই সব বস্তুতে অমঙ্গাল রয়েছে। ইবনে কাতিবা বলেন, অজ্ঞতার যুগে মানুষ অসূয়া বিশ্বাস করত। হুযুর (সা.) তাদেরকে এমন বিশ্বাস পোষণ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে অপয়া বলে কোনও জিনিস হয় না। তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) তিনটি বস্তুর অপয়া হওয়ার বিষয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

(ফতহুল বারি, শারাহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার)

অনুরূপভাবে একথাও বলা হয়ে থাকে যে, এই হাদীসে হুযুর (সা.) নিজের অবস্থানের কথা বলেন নি। বরং তৎকালীন সময়ের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের কথা বর্ণনা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে রয়েছে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে যেখানে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন, হুযুর (সা.) বলেছেন, ঘোড়া, মহিলা এবং গৃহ- এই তিনটি জিনিসে অমঙ্গাল থাকে। একটি হাদীস অনুসারে একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) ভীষণ রুষ্ট হন এবং বলেন, হুযুর (সা.) এমনটি কখনই বলেন নি। বরং হুযুর (সা.) বলেছিলেন- অজ্ঞতার যুগের লোকেরা এই তিনটি জিনিসকে অমঙ্গালের কারণ হিসেবে মনে করত।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, কিতাব বাকি মুসনাদুল আনসার, হাদীস-২৪৮৪১) আর অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর এই কথাটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন- হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হুযুর (সা.) কথার শেষাংশ শুনেছিলেন মাত্র, প্রথমাংশ শোনেন নি। বস্তুত, হুযুর (সা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের ধ্বংস করুক যারা বলে তিনটি বিষয়ে অমঙ্গাল রয়েছে।

(মুসনাদ আবু দাউদ)

একটি অর্থ এটিও করা হয়েছে যে, বস্তুত এই হাদীস দ্বারা অজ্ঞতার যুগে অপয়া প্রসঙ্গে ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডণ করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, কারো বাড়ি যদি এমন হয় যেখানে সে থাকতে অপছন্দ করে, অথবা কারো স্ত্রী যদি এমন হয় যার সঙ্গ তার অপছন্দনীয় হয় বা কারো ঘোড়া যদি এমন যার সওয়ারী সে অপছন্দ করে তবে এমন ব্যক্তির উচিত সেই বস্তুগুলি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে একথাও বলা হয়েছে যে, মারকুটে ঘোড়া, স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারীণি স্ত্রী এবং এমন বাড়ি অপয়া হওয়ার কারণ যা মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে আযানের ধ্বনি পৌঁছয় না।

(ফতহুল বারি, শারাহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার)

যাইহোক এগুলি বিভিন্ন ব্যাখ্যা যা হাদিস ব্যাখ্যাকারীগণ নিজের নিজের বোধগম্যতা অনুযায়ী উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু এই হাদীসটির বিষয়ে প্রণিধান করলে এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শিক্ষামালাকে সামনে রাখলে দেখা যাবে যদি এই হাদীসের অর্থ করা হয় যে মহিলা, ঘোড়া এবং বাড়ি অসূয়ার কারণ,তবে তা সঠিক হবে না। কেননা আঁ হযরত (সা.) এই তিনটি জিনিস পছন্দ করেছেন আর এদের প্রশংসা করেছেন। বাড়ি এবং ঘোড়া তিনি (সা.) ব্যবহার করতেন অপরদিকে মা, স্ত্রী এবং কন্যা হিসেবে মহিলাদের প্রতি তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। মহিলাদের সম্পর্কে মা হিসেবে তিনি বলেছেন, 'জান্নাত হল মায়েদের পায়ের নীচে'। (সুনান নিসাই, কিতাবুল জিহাদ) পুণ্যবতী স্ত্রীকে তিনি (সা.) পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম সম্পদ আখ্যায়িত করেছেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুর রিজা)। কন্যা সন্তানের সঠিক প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণকে জান্নাতে প্রবেশের এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাতিল আদাব) স্ত্রীর প্রতি সদাচারী স্বামীকে সর্বোত্তম পুরুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুর রিযা) আর জাগতিক উপকরণের মধ্যে নারী জাতি এবং সুগন্ধী তিনি (সা.) প্রিয়তম বস্তু আখ্যায়িত করেছেন। (সুনান নিসাই, কিতাব আশারাতুন নিসা)

অনুরূপভাবে কুরআন করীম ঘোড়াকে মানুষের জন্য সৌন্দর্যের কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (সুরা নহল: ৯) ঘোড়ার প্রতি হযরত সুলেমান (রা.)-এর অসাধারণ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশকে যিকরে ইলাহির কারণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সোয়াদ: ২৩-৩৪) এছাড়াও আঁ হযরত (সা.) ঘোড়ার অসাধারণ গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে আশিস ও কল্যাণ লেখা হয়েছে।'(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার)। গৃহ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সা.) আনসারদের মধ্য থেকে বনু নাজার, বনু আব্দুল আশহাল, বনু হারিস এবং বনু সাআদ-এর গৃহগুলিকে সর্বোত্তম গৃহ আখ্যায়িত করেছেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব) তাছাড়া হাদীসে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, নতুন বাড়ি ও ঘোড়া কেনার পর এবং নতুন স্ত্রী বাড়িতে এলে সদকা দাও। কারণ, আল্লাহ্ তা'লা এই জিনিসগুলির কুপ্রভাব থেকে যেন নিরাপদ রাখেন আর এর মাধ্যমে আশিস লাভ হয়।

অতএব, কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.) দ্বারা এই জিনিসগুলিকে প্রশংসনীয় আখ্যায়িত করা প্রমাণ করছে যে উপরোক্ত হাদীসের অর্থ মোটেই সেই অর্থ নয় যার কারণে এই হাদীসটি আপত্তিজনক হতে পারে।

এই সমস্ত বিষয় ছাড়াও এই হাদীসটি বোঝার জন্য সেটিই মূল নীতি যা এই যুগের 'হাকাম' (মীমাংসাকারী) এবং 'আদাল' (ন্যায় বিচারক) সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হাদীসটির প্রথমাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর রচনা নুরুল হক-এর বর্ণনা করেছেন।

হুযুর (আ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে উপরোক্ত হাদীসের পরবর্তী অংশেরও এই অর্থ দাঁড়াবে যে, নারী হোক বা বাহন বা বাড়ি- এগুলির ভাল বা মন্দ প্রভাব খোদা তা'লার আদেশেই অন্যের উপর পড়তে পারে। বা ভিন্ন বাক্যে আমরা বলতে পারি যে, স্ত্রী হোক ঘোড়া হোক বা বাড়ি হোক- মানুষ খোদা তা'লার ইচ্ছানুসারেই এগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তবে এর সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এর দ্বারা এমন বিভ্রান্তি তৈরী হওয়াও উচিত নয় যে কোনও জিনিসের ভাল বা মন্দ প্রভাব তৈরী হওয়ার বিষয়ে মানুষের কোনও ভূমিকা নেই, যা কিছু হয় কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কেননা কুরআন ও হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী থেকে এই বিষয়টিকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের কর্ম অনুসারেই আল্লাহ্ তা'লা পরিণাম প্রকাশ করে থাকেন। সূরা তাবাগুনে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্য হতে কতিপয় তোমাদের শত্রু। অতএব, তাদের থেকে তোমরা সতর্ক থেকো।

(সূরা তাবাগুন: ১৫-১৬)

সূরা নূরে বলেন, 'অপবিত্র মহিলা অপবিত্র পুরুষদের জন্য আর অপবিত্র পুরুষ অপবিত্র মহিলাদের জন্য। আর পবিত্র মহিলা পবিত্র পুরুষদের জন্য আর পবিত্র পুরুষ পবিত্র মহিলাদের জন্য। (সূরা নূর: ২৭) এছাড়া একটি হাদীসে একথারও উল্লেখ রয়েছে যে, পুণ্যবতী স্ত্রী, ভাল ঘর এবং ভাল বাহন মানুষের জন্য সৌভাগ্যের কারণ। আর অসৎ মহিলা, মন্দ গৃহ এবং বাহন মানুষের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল,হাদীস-১৩৬৮)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে বলেন:

যখন মানুষের দিক হইতে কোনও কার্য প্রকাশিত হয়, তখন খোদাও তাঁহার দিক হইতে অনুরূপ এক ক্রিয়া প্রকাশ করেন। যেমন মানুষ যখন তাহার প্রকোষ্ঠের সব দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন মানুষের এই কার্যের পর খোদা তা'লার পক্ষ হইতে এই ক্রিয়া হইবে যে, তিনি সেই প্রকোষ্ঠে অন্ধকার সৃষ্টি করিবেন। কারণ, খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়মে আমাদের কার্যের অনিবার্য ফলস্বরূপ যাহা যাহা নির্ধারিত হইয়াছে, ঐ সবই খোদা তা'লার ক্রিয়া। কেননা, তিনিই সব কারণের আদি কারণ। অনুরূপভাবে যদি কেহ বিষ পান করে,তবে তাহার এই কার্যের পর খোদা তা'লার যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে, তাহা হইল, তাহার মৃত্যু ঘটিবে। তেমনই যদি কেহ এমন অনুচিত কর্ম করে, যাহা কোনও সংক্রামক ব্যাধির কারণ হয়, তবে তাহার এই কর্মের পর খোদা তা'লার যে ক্রিয়া প্রকাশিত হইবে উহা এই যে, সেই সংক্রামক ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিবে। সুতরাং আমাদের পার্থিব জীবনে যেমন স্পষ্ট দেখা যায় যে, আমাদের প্রত্যেক কার্যের এক অনিবার্য ফল আছে এবং সেই ফল খোদা তা'লার ক্রিয়া, তেমনই ধর্ম সম্পর্কেও ইহাই বিধান। খোদা তা'লা নিম্ন বর্ণিত দুইটি উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার বলেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت: 70) فَلَمَّا
زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ (الصّف:6)

অর্থাৎ, 'যাহারা এই কর্ম করে যে, তাহারা খোদা তা'লার অন্বেষণে পুরোপুরি চেষ্টা করে, এই কর্মের জন্য আমাদের এই ক্রিয়া অনিবার্য যে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথ প্রদর্শন করিব। (২৯:৭০) এবং যাহারা কুটিলতা অবলম্বন করে এবং সোজা পথে চলিতে চাহিতে না, তদবস্থায় আমাদের ক্রিয়া তাহাদের বেলা এই হইবে যে, আমরা তাহাদের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিব"। (৬১:৬)

(ইসলামি ওসুল কি ফিলাসফি, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৮-৩৮৯)

নিয়মিত সাইকেল চালান এবং অন্যান্য খেলাধুলায়ও অংশগ্রহণ করেন যাতে বয়স বাড়ার সঙ্গে ফিটনেস বজায় থাকে। * প্রথমে নিজের বাড়ি থেকে শুরু করুন। বাড়ি হল আমার আমেলা সদস্যবৃন্দ। আমেলা সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে কতজন পড়েছেন? *সর্বপ্রথম আমেলা সদস্যবৃন্দের কাছে রিপোর্ট নিন। আনসারুল্লাহ্ ইসলামের বাণী প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। মজলিস আনসারুল্লাহকে অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতীয় স্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে সর্বোত্তম পরিণাম প্রকাশ পায়। *আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে জলের পাম্প এবং আদর্শ গ্রাম (যার অধীনে স্থানীয় গ্রামীণ জনগণকে জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাবলী উপলব্ধ করানো হয়ে থাকে) নির্মাণের কাজে সহায়তা করা উচিত আর একটি প্রকল্প শুরু করা উচিত। *আমাদেরকে দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। নিজেদের পক্ষ থেকে অপরের পক্ষ থেকে হোক, কর্মীদের এই চিন্তাধারা রাখতে হবে যে আমরা খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে কাজ করছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে হল্যাণ্ডের আনসারবৃন্দের ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান

১৫ই আগস্ট ২০২১ তারিখে ন্যাশনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্ হল্যাণ্ডের কর্মীবৃন্দের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) অনলাইন সাক্ষাত করেন।

হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ টিলফোর্ডের অফিস থেকে সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিসে আমেলার সদস্যবৃন্দ নানস্পীট স্থিত মসজিদ বায়তুন নুর কমপ্লেক্স থেকে অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এক ঘন্টা ব্যাপী এই সাক্ষাতানুষ্ঠানে মজলিস আনসারুল্লাহ সদস্যবৃন্দ হুযুর আনোয়ারের নিকট নিজেদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের রিপোর্ট উপস্থাপন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মজলিসের কর্মীবৃন্দকে সাইকেল চালানোর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তারা যেন নিয়মিত সাইকেল চালান এবং অন্যান্য খেলাধুলায়ও অংশগ্রহণ করেন যাতে বয়স বাড়ার সঙ্গে ফিটনেস বজায় থাকে। বয়স বাড়ার প্রভাব মানসিক আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায়। যদি কোনও ব্যক্তি ইতিবাচক চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করে আর মনের দিক থেকে তরুণ থাকে তবে তার সার্বিক স্বাস্থ্য এবং পরিস্থিতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কায়েদ সাহেব তালিমের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে আপনি আনসারদেকে বছরে কতগুলি বই পড়তে দেন? তিনি বলেন, আগে বেশি দিতাম, কিন্তু এবার একটি করে বই দিয়েছি- হাকীকাতুল ওহী। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাকে বলুন যে আমেলা সদস্যদের মধ্যে কতজন পড়েছেন? প্রথমে নিজের বাড়ি থেকে শুরু করুন। বাড়ি হল আমার আমেলা সদস্যবৃন্দ। আমেলা সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে কতজন পড়েছেন? সর্বপ্রথম আমেলা সদস্যবৃন্দের কাছে রিপোর্ট নিন। সদর সাহেবের কাছে রিপোর্ট দিয়ে শুরু করুন। এরপর বাকিদের কাছে রিপোর্ট চান। আমেলা সদস্যদের পড়া হলে যঈমদের কাছে যান এবং দেখুন যে তারা পড়লেন কি না। এরপর নাযিমদের কাছে যান। এরপর সাধারণ সদস্যদের কাছে যান এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার আমলা সদস্যদের প্রত্যেক স্তরের কর্মীদেরকে বই পড়াতে পারেন বা কোনও কর্মসূচিতেও যুক্ত করতে পারেন তবে আপনার তজনীদের ৬০ শতাংশ কাজ এমনিতেই পুরো হয়ে যায়। বিভিন্ন স্তরের আমেলা সদস্যরা যদি সক্রিয় হয়ে ওঠে তবে ষাট শতাংশ কাজ হয়ে যাবে, কোনও সমস্যা থাকবে না। সমস্যা হল আমরা কেবল বাড়িতে বসে নির্দেশ দিই, নিজেরা পড়ি না।

কায়েদ তালিমকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি বইটি পড়েছেন কি না আর বইটির প্রথমাংশে কি বিষয় বর্ণিত হয়েছে? তিনি উত্তর দেন যে বইটির সত্তর শতাংশ তিনি পড়েছেন আর বইয়ের প্রথমাংশে ওহীর প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সারসংক্ষেপ এই যে স্বপ্ন দেখে বেশি আপ্লুত হয়ে পড়ো না। আসল বিষয় হল পুণ্যকর্ম ও তাকওয়া। যাইহোক আপনারা কায়েদগণের কাছ থেকে রিপোর্ট নিন, তাদের মধ্য থেকে কতজন পড়েছেন তা জানতে চান। এরপর পর্যায়ক্রমে যঈম, নাযিম এবং মুনতাযিমদের কাছেও রিপোর্ট নিন। এরপর সাধারণ আনসার সদস্যদের কাছে জানতে চান এবং প্রত্যেক স্তরের উপর যে নাযিম তালিম নিযুক্ত রয়েছেন তাকে খোঁজ নিয়ে রিপোর্ট দেওয়ার কাজে সক্রিয় করুন।

ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার পূর্ণ প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে হল্যাণ্ডে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়। এছাড়া তিনি (আই.) এও বলেন যে, মজলিস আনসারুল্লাহকে অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতীয় স্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে সর্বোত্তম পরিণাম প্রকাশ পায়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) 'ইসার' বিভাগ সম্পর্কে মজলিস আনসারুল্লাহকে তাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-তাদেরকে আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলে জলের পাম্প এবং আদর্শ গ্রাম (যার অধীনে স্থানীয় গ্রামীণ জনগণকে জীবনধারণের মৌলিক চাহিদাবলী উপলব্ধ করানো হয়ে থাকে) নির্মাণের কাজে সহায়তা করা উচিত আর একটি প্রকল্প শুরু করা উচিত।

সাক্ষাতানুষ্ঠানের শেষে একজন নাসির প্রশ্ন করেন যে, আমাদের ন্যাশনাল আমেলা সদস্য এবং অনুরূপভাবে স্থানীয় স্তরেও আমেলা সদস্যদের প্রতি বিভিন্ন সময় আনসারদের আচরণ এমন হয়ে থাকে যার কারণে তারা নিরুৎসাহিত হন। তাদেরকে উৎসাহিত করতে কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি তারা সেই সব সদস্যদের জন্য কাজ করছেন তবে তাদের নিরুৎসাহিত করা বৈধ আর যদি তারা খোদা তা'লার কারণে কাজ করছেন তবে নিরুৎসাহিত করা অবৈধ। প্রথমত আনসারগণ শিশু নন। মাশাআল্লাহ্ চল্লিশ বছরের পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর আনসারে উত্তীর্ণ হন। এরপর যদি কোনও নাসির এর পক্ষ থেকে নিরুৎসাহিত করাও হয়ে থাকে, অনেক সময় বয়স্কদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে যারা পঁয়ষট্টি বছর পার করে ফেলেন তারা কথা শোনান আবার কিছু কম বয়স্ক আনসাররাও এই কাজ করে থাকেন। কিন্তু সচরাচর বয়স্কদের পক্ষ থেকে এমনটি হয়ে থাকে। এর জন্য আপনাদের এই চিন্তাধারা থাকা উচিত আর প্রত্যেককে একথা বলুন যে আমরা খোদা তা'লার জন্য কাজ করব আর যখন খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে কাজ করব সেক্ষেত্রে ব্যক্তির নিরুৎসাহ দান বা ভর্ৎসনার পরোয়া করা উচিত নয়। আপনারা তো আর শিশু নন। মাশাআল্লাহ্ চল্লিশ বছর পূর্ণ করার পর পরিণত হয়েছেন। এই বয়সে কেউ নিরুৎসাহিত করলেও কি আসে যায়? আঁ হযরত (সা.) নবুয়্যতের মর্যাদা লাভের পর যখন তাঁর আত্মীয় স্বজনদের ডেকে তবলীগ করলেন, তখন খাওয়ার পর সকলেই গাত্রোত্থান করেছিল আর এইভাবে তাঁর উৎসাহকে দমিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে আঁ হযরত (সা.) কি পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন? কিছু দিন পর তিনি পুনরায় নেমন্ত্রনের ব্যবস্থা করলেন। এবার তিনি প্রথমে নিজের বার্তা পৌঁছে দিলেন অতঃপর তাদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করলেন। এরপরও তারা খাওয়ার পর সেখানে দাঁড়াল না। ভীষণ একগুঁয়ে ধরণের মানুষ ছিল তারা। এই ঘটনার ফলে কি আঁ হযরত (সা.) হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন? আমাদেরকে দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। নিজেদের পক্ষ থেকে অপরের পক্ষ থেকে হোক, কর্মীদের এই চিন্তাধারা রাখতে হবে যে আমরা খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে কাজ করছি। আর যখন খোদা তা'লার জন্য কাজ করছি, সেক্ষেত্রে মানুষের প্রশংসা এবং নিন্দার পরোয়া করাই উচিত নয়।যেখানে আল্লাহ তা'লা আমাদের কাজের প্রতিদান দিবেন, অতএব কেবল তাঁর কাছেই প্রতিদান চান, বান্দার কাছে কোনও প্রকার পুরস্কার কেন চাইছেন?

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ৩১ আগস্ট, ২০২১)

অন্ততপক্ষে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে নামায পড়লে পরবর্তী প্রজন্মও পাঁচ ওয়াক্ত ও বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত হবে এবং বা-জামাত ও পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। কুরআন করীম পাঠের অভ্যাস তৈরী করুন আর আনসারদের এই দায়িত্ব দিন তারা নিজের নিজের বাড়ির খোঁজ খবর রাখবে যে তাদের পরিবারে শিশুরা নামায এবং কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে কি না? অনুরূপভাবে বাড়িতে যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-উদ্ধৃতিসহকারে দরসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে তরবীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও তা ভাল হবে। পুরো দেশে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু করুন।

২১ শে মার্চ, ২০২১ তারিখে ন্যাশনাল আমেলা মজলিস আনসারুল্লাহ্ অস্ট্রেলিয়া এবং আঞ্চলিক কায়েদগণের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস -এর অন সাক্ষাত অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে মজলিসে আমেলার সদস্যগণ সিডনি স্থিত মসজিদ বায়তুল হুদা-র খিলাফত সভাগৃহে একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট দীর্ঘ এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানে আমেলার সমস্ত সদস্যগণ নিজের নিজের বিভাগের কর্মতৎপরতা এবং প্রচেষ্টাবলীর রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। অতঃপর হুযুর আনোয়ারের নিকট দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

সাক্ষাতের শুরুতে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, কোভিড পরিস্থিতি কেমন আর এখানে অংশগ্রহণকারীরা মাস্ক পরেন নি কেন? এর উত্তরে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় কোভিড অনেকাংশে নিয়ন্ত্রনে চলে এসেছে এবং বিধি নিষেধ অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। আগামী দুই দিনে এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সেই কারণে মাস্ক পরে নি। এরপর হুযুর আনোয়ার দোয়া করান।

সাক্ষাতকালে মজলিস আনসারুল্লাহর সদস্যদেরকে হুযুর আনোয়ার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আনসারদের নিজেদের পরকালের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত। এই বয়সে পৌঁছে ১০০ শতাংশ নামাযী হওয়া উচিত। আনসাররা কি বলেন? তাদের বয়স বাড়ছে, তাদেরকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। জনৈক কবির উদ্ধৃতি ' ওয়াক্ত কা পঞ্ছী উড় যায়ে, উমর কা সায়া ঘাটতা যায়ে।' (অর্থাৎ সময়ের পাখি উড়ে চলে, বয়সের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে থাকে।' তাই একথা চিন্তা করলে উদ্বেগ হওয়া উচিত। এই জন্য আনসারদের বলুন অন্তত তারা যেন পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে আর যাদের সুযোগ রয়েছে, তারা যেন বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করে। তাদের নামায সেন্টার বা মসজিদ যদি দূরে হয় তবে বাড়িতেই বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করুন। অন্ততপক্ষে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে নামায পড়লে পরবর্তী প্রজন্মও পাঁচ ওয়াক্ত ও বা-জামাত নামাযে অভ্যস্ত হবে এবং বা-জামাত ও পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। এ বিষয়ে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করুন। অনুরূপভাবে কুরআন করীম পাঠের অভ্যাস তৈরী করুন আর আনসারদের এই দায়িত্ব দিন তারা নিজের নিজের বাড়ির খোঁজ খবর রাখবে যে তাদের পরিবারে শিশুরা নামায এবং কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে কি না? অনুরূপভাবে বাড়িতে যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-উদ্ধৃতিসহকারে দরসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে তরবীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও তা ভাল হবে। যেভাবে দূরে চলে যাচ্ছি, যুগ দূরে সরে যাচ্ছে, সন্তানদের তরবীয়ত করে নতুন প্রজন্মকে অবক্ষয় মুক্ত রাখার ব্যাপারে আনসারদের দায়িত্বাবলী আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে। এখন আনসার যদি নতুন প্রজন্মকে না সামলায় তাহলে কয়েক বছর পর অনেক বড় সমস্যা দেখা দিবে। এই সব দেশে থেকে তারা পুরোদস্তুর দুনিয়াদার হয়ে পড়বে।

সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ার পুনরায় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের বিষয়ে জোর দিয়ে জানতে চান যে আপনাদের এখানে কি একশ শতাংশ আনসার কুরআন পড়তে জানে। হুযুর কে জানানো হয় যে তিন শতাংশ খুদ্দাম পড়তে জানে না। হুযুর বলেন, তাদের জন্য ব্যবস্থা করুন, কিছু আসে যায় না। অনেক বুড়ো বুড়ে আনসার আগ্রহসহকারে কুরআন পড়ছে। কালকেই আমি একথার উল্লেখ করেছিলাম, ঘানার হাফিয হরহুম বোয়েতাং সাহেব ৪৮ বছর বয়সে পুনরায় কায়েদা এবং কুরআন পড়েন যাতে তাঁর উচ্চারণ সঠিক হয়। তাই এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ্‌র বাণী শিখতে কোনও অসুবিধে নেই। সঠিক প্রচেষ্টা থাকলে সফলতাও আসে। কেবল 'চেষ্টা করব' বলবেন না।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী ওয়াকার আমলকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,'পুরো দেশে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু করুন।সাম্প্রতিক কালে জঙ্গলে দাবানলের ফলে অনেক বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। তাই এই পরিস্থিতিকে দৃষ্টিপটে রেখে বৃক্ষ রোপনের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার দ্বিতীয় সারির আনসারদের খেলাধুলার বিষয়ে জানতে চান যে কতজন আনসার সাইকেল ব্যবহার করেন। একজন নাসির উত্তর দেন যে ৯৭ শতাংশ আনসার সাইকেল চালান, যাদের মধ্যে ৩২ শতাংশ দ্বিতীয় সারির আনসার অপরদিকে ৬৫ শতাংশ প্রথম শ্রেণীর আনসার। তাঁরা নিয়মিত সাইকেল চালান। হুযুর বলেন, বকিদেরও সাইকেল চালানোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তারা যেন অন্ততপক্ষে কমদূরত্বের গন্তব্যের জন্য সাইকেল ব্যবহার করেন। এভাবে সাইকেল ব্যবহার করে নিজের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতেও ভূমিকা পালন করুন।

একজন আনসার পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, তালাক দেওয়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে আনসারদের কি ভূমিকা থাকা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দুনিয়াদারির দাপট বেশি যাচ্ছে আর ধৈর্য ও উদ্যম হ্রাস পেয়েছে। ছেলে হোক বা মেয়ে, ভুল উভয় পক্ষেরই হয়ে থাকে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করি ঠিকই, কিন্তু আঁ হযরত (সা.)এর এই কথাটি স্মরণ রাখি না- তোমরা বিবাহ সম্পর্ক করার সময় এই বিষয়টি যাচাই করো যে জাগতিক ধন-সম্পদ বা সৌন্দর্যের পরিবর্তে ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাই আমরা যদি এই বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রাখে তাহলে সমস্যা কম হবে। বস্তুবাদিতার প্রভাব আমাদের আহমদী সমাজের উপর পড়ছে। এর জন্য সংশোধনীয় কমিটি এবং তরবীয়তী সেক্রেটারীদেরকে জামাতীয় ভাবে এবং লাজনার তরবীয়ত সেক্রেটারী, খুদ্দামদের মুহতামিম তরবীয়ত এবং আনসারদের কায়েদ তরবীয়তকে সম্মিলিতভাবে নিজের নিজের পরিবেশে তরবীয়তের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে যে আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছি আর তা সত্ত্বেও আমরা এই অঙ্গীকার রক্ষা করছি না, উল্লঙ্ঘন করে চলেছি, জাগতিক কামনা-বাসনাতেই এগিয়ে চলেছি। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা মেয়েদের মধ্যেও হ্রাস পেয়েছে আর ছেলেদের মধ্যেও। এই বিষয়টিও আমি লক্ষ্য করেছি। এই কারণে ইসলামের উপর যে আপত্তি করা হয় যে আরেঞ্জ ম্যারেজ হওয়ার কারণে আমাদের সম্পর্ক খাপ খায় নি। তাই আমাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গিও সঠিক নয়। পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে এই প্রবণতা তৈরী হচ্ছে। আর দুনিয়াদারির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতা যেহেতু আমাদের সমাজেও প্রবেশ করছে তাই আমাদের আরও বেশি সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

একটি বিষয় হল সম্পর্ক হওয়ার পর তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত ভাল সম্পর্ক পাওয়া যায় না, পারিবারিক সমস্যাবলী রয়েছে। যদি মেয়েদের সঠিক তরবীয়ত করেন, আনসারগণ সন্তানদের সঠিক প্রশিক্ষন দেন, খুদ্দামরা নিজেদের ভাইদের সঠিক

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** Weekly **BADAR** Qadian
কাদিয়ান

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 25 Aug, 2022 Issue No. 34

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

খুতবার শেষাংশ....

উলায়েস-এর যুদ্ধ শেষ করেন তখন তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমগোয়শিয়া আসেন কিন্তু তাঁর আসার পূর্বেই সেখানকার অধিবাসী দ্রুত গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে এবং সওয়াদ নামক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইরাকের সেসব জনপদ মুসলমানরা হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে জয় করে আর ক্ষেতের সবুজ-শ্যামলতার কারণে একে সওয়াদ নামকরণ করা হয়।হযরত খালেদ (রা.) আমগোয়শিয়া ও এর আশপাশে যা কিছু ছিল সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করার আদেশ প্রদান ক রেন। আমগোয়শিয়া হীরার সমান (একটি) শহর ছিল। উলায়েস-এ সেই এলাকার সেনাছাউনি ছিল।

আমগোয়শিয়াতে মুসলমানরা এত বেশি মালে গনিমতলাভ করে যে, যাতুস্ সালাসি ল (যুদ্ধাভিযান)থেকে শুরু করে তদবধি কোনো যুদ্ধে লাভ হয়নি।

এই যুদ্ধে অশ্বারোহীরা পনেরশ দিরহাম করে লাভ করে আর এই অংশ সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বাইরে ছিল যা অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের দেওয়া হয়েছিল। উলায়েস ও আমগোয়শিয়ার বিজয়ের সংবাদ হযরত খালেদ (রা.) বনু ইজল (গোত্রের) জান্দাল নামক এক ব্যক্তির মারফত প্রেরণ করেছিলেন, যিনি একজন সাহসী গাইড(তথা পথপ্রদর্শক) হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে উলায়েস বিজয়ের সুসংবাদ, মালে গনিমতের পরিমাণ, যুদ্ধবন্দিদের সংখ্যা, খুমুসে (বা গনিমতের এক-পঞ্চমাংশে) যেসব জিনিস লাভ হয় এবং যেসকল ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তাদের বিস্তারিতএবং বিশেষভাবে হযরত খালেদ (রা)-এর বীরত্বগাঁথাঅতি উত্তমরূপে বর্ণনা করেন। তাঁর সাহস , সুচিন্তিত মতামত এবং বিজয়ের সংবাদ উপস্থাপনের ধরন হযরত আবু বকর (রা.) খুবই পছন্দ করেন। অর্থাৎ যে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল তাঁর বর্ণনার রীতি আর বীরত্বগাঁথা উপস্থাপনের যে পদ্ধতি ছিল তাহযরত আবু বকর (রা.) খুব পছন্দ করেন। তিনি (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? সে নিবেদন করে, আমার নাম জান্দাল। তিনি (রা.) বলেন, জান্দাল খুব সুন্দর! অতঃপর তিনি (রা.) তাঁকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে একজন দাসী প্রদানের আদেশ দেন, যার ঘরে তার সন্তান হয়েছিল।এভাবে সেসময় হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এখন আর মহিলাদের গর্ভেখালেদবিন ওয়ালিদের মত সন্তানের জন্ম হবে না।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪-৩১৫) (হযরত সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- হ্যায়কল, পৃ: ৩১২) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০১) (মুজামুল বুলদান, পৃ: ৩০৯)

বাকি (অংশ) ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে (বর্ণনা করা হবে)।

১ম পাতার পর....

একটি বিরাট রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এখানে বর্ণিত হয়েছে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মতবিরোধের কারণে গোটা ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায় আর সমগ্র জাতির পরিশ্রম বিফলে যায় তখন আবার নতুন করে পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভেঙ্গে যাওয়া বস্তু সেভাবে আর জোড়া লাগে না যে সেটিকে আর নতুন বলা যায়। বিদীর্ণ হৃদয় পুনরায় সেভাবে মিলিত হয় না যেভাবে তারা সব সময় একত্রিত ছিল। অতএব, এই অঙ্গীকার রক্ষার জন্য অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন।

এই আয়াতের শব্দাবলী থেকে বোঝা যায় যে, এতে ভিন জাতির সঙ্গে চুক্তির বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াতটিকে একটি স্থায়ী বিষয় আখ্যা দিতে হবে। অর্থাৎ ‘লা তাকুনু’ থেকে নতুন বিষয় শুরু হল বলে ধরতে হবে আর যার অর্থ হবে যেভাবে আল্লাহ্ তা’লার অঙ্গীকার এবং এবং নিজেদের মধ্যেকার অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যক, অনরূপভাবে অপর জাতির সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও আবশ্যক। এই চুক্তিগুলির বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখো, অন্যথায় পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই ‘দাখালান’ শব্দটি এই বিষয়টিকেই প্রকাশ করে। আর كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ বলতেও একথাই বোঝানো হয়েছে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরী করো না।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:

১১ এর পাতার পর....

তরবীয়ত করে আর ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরী হয় তবে তা সফলও হবে। আর হয়ে থাকে। যারা জাগতিকতাকে সামনে রেখে সম্পর্ক করে তাদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। এটা এক দীর্ঘ এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যা সম্পাদান করা তরবীয়ত ও সংশোধন সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্ব। এ বিষয়ে চেষ্টা করতে থাকুন। কেবল জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতেই সব কিছু ছেড়ে দিবেন না, আনসারদের এই মর্মে তরবীয়ত করুন যে তারা সন্তানদের তরবীয়ত করবেন। দোয়া করে ভাল সম্পর্ক তৈরী করা উচিত। এরপরও কিছু কিছু জটিলতা তৈরী হয় বটে কিন্তু তা নগণ্য। সাধারণভাবে সঠিক প্রচেষ্টা করলে সমস্যা কম তৈরী হওয়া সম্ভব।

এরপর আরও এক আনসার প্রশ্ন করে যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে আসা সত্ত্বেও পৃথিবীর মনোযোগ কেন যুগ ইমামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না? অথচ কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন-

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন, তোমরা সেদিকে মনোযোগ না দিলে আযাবের দিকে অগ্রসর হবে আর ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি (আ.) এও বলেছেন যে, তোমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতকে গ্রহণ করবে এমনটি আবশ্যক নয়। এই আযাব এড়াতে যদি আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার অধিকার প্রদান করা শুরু করে দাও আর যে সব অযথা ও বাজে কাজকর্ম এবং পাপ রয়েছে সেগুলি থেকে বিরত থাক তবে আল্লাহ্ তা’লার কৃপাও গতিশীল হবে আর তোমরা এভাবে আযাব থেকে রক্ষা পাবে। অতএব, জগত এই মুহূর্তে জাগতিকতায় নিমজ্জিত। তারা উপলব্ধি করতে পারছে না যে এই সব কিছু কেন ঘটছে। এ সব সত্ত্বেও আমরা সতর্কও করে থাকি। সম্প্রতি আমি রাষ্ট্রনেতাদের নামে পত্র লিখেছিলাম। তাদেরকেও আমি বলেছিলাম যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর বিষয়ে যদি মনোযোগ না দাও তবে আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে দুর্যোগও নেমে আসবে। এখনই দেখুন, এই যে কোভিড এল বা কোনও সুনামি বা ঝড় ও ভূমিকম্প আসে তখন মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হয়। কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণ করতে থাকে। নিজের নিজের ধর্ম অনুসারে কেউ আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে কেউ রাম রাম যপ করে কেউ বা অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টা করে যাতে অধিকার প্রদান করতে পারে, মানুষ এবং আল্লাহ্ উভয়েরই। কিন্তু সেই শাস্তি যখন অপসারিত হয় তখন তারা পুনরায় পূর্বের স্থানে চলে আসে। পরিশেষে এটাই হবে, যদি না মানে, না বোঝে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী জাতিরাও ধ্বংস হয়ে এসেছে, এখনও ধ্বংস হচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে আর যারা পুণ্যবান হবেন তারা ক্রমশ নিজেদের সংশোধন করবে। অতএব, আমাদের কাজ হল সতর্ক করা, বার্তা পৌঁছে দেওয়া,তবলীগ করা, প্রত্যেকের কাছে পৌঁছনো- আর হিদায়াত দেওয়া আল্লাহ্‌র কাজ। আমরা গুরুত্বসহকারে আমাদের কাজ করে যাব।আর এভাবেই আাদের কর্তব্য পালন হতে থাকবে। আর দোয়াও করুন যে আল্লাহ্ তা’লা যেন এদেরকে হিদায়াত দান করেন আর জাতি সমূহ ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এটি আমাদের দায়িত্ব আর এই কাজই আমরা নিরন্তর করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী টিকে আছে। আমরা পৃথিবীর সংশোধনের ঠিকা নিই নি। আমরা যে ঠিকা নিয়েছি তা হল আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেওয়ার এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকার প্রদান করা শেখানো এ দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং সেই সঙ্গে তাদের জন্য দোয়াও করা। এই কর্তব্য আমরা যদি যথাযথভাবে পালন করে থাকি, তবে প্রকৃতপক্ষেই আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করছি আর গুরুত্বসহকারে করে থাকি তবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হব। বাকি আল্লাহ্‌র বিষয় এবং তাঁর বান্দাদের বিষয়।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ শে আগস্ট, ২০২১)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir